# বাংলাভাষার সেরা রূপকথা

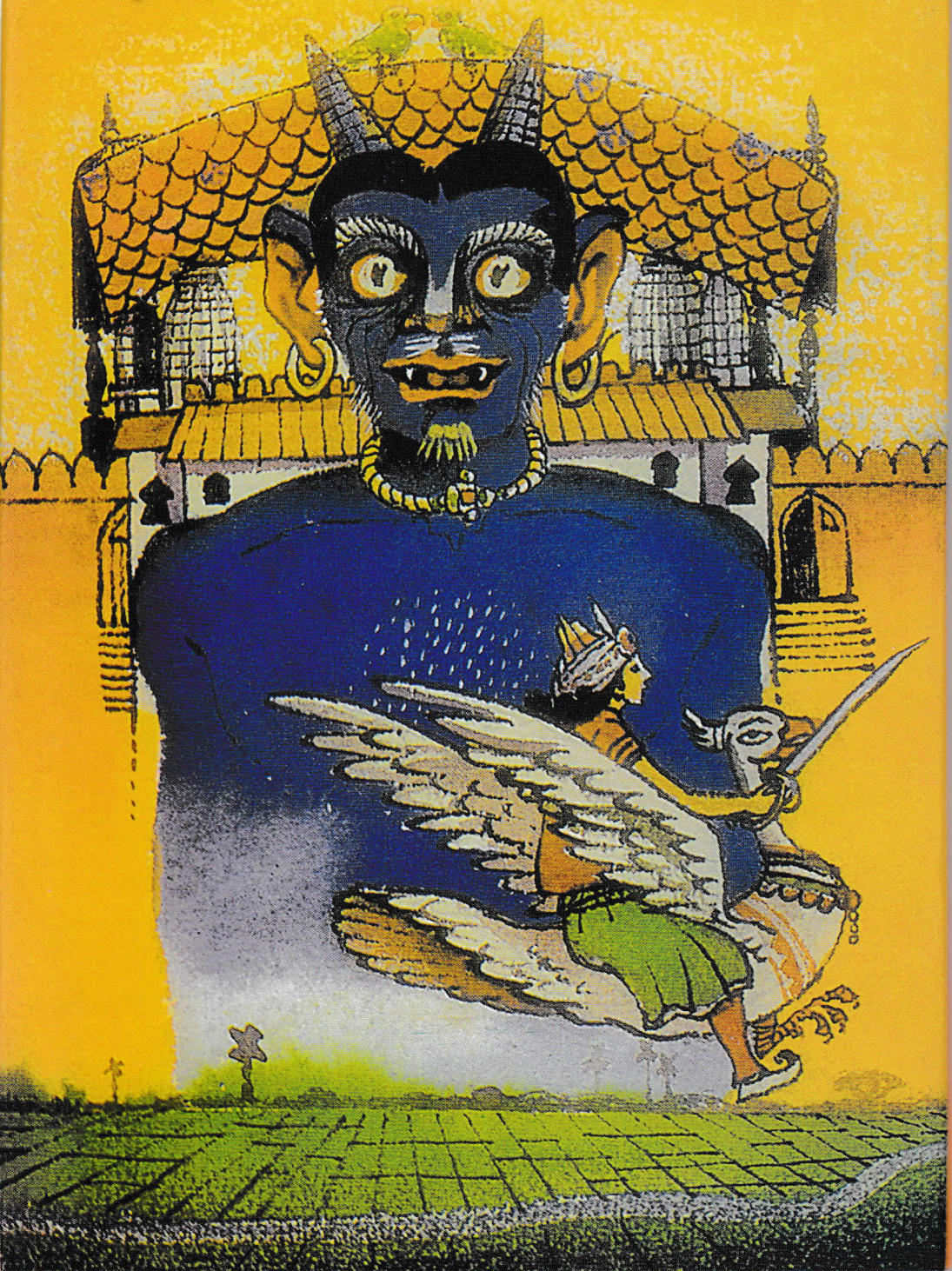

আলোকিত মানুষ চাই

# বাংলাভাষার সেরা রূপকথা

সম্পাদনা
আহমাদ মাযহার

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৯৪

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
মাঘ ১৪০১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

ষষ্ঠ সংস্করণ একাদশ মুদ্রণ
অগ্রহায়ণ ১৪২৩ ডিসেম্বর ২০১৬

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০
ফোন : ৯৬৬০৮১২ ৫৮৬১২৩৭৪ ০১৮৩৯৯০৬৭৫৪

মুদ্রণ
ওমাসিস প্রিন্টার্স
২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

ছবি এঁকেছেন
সৈয়দ এনায়েত হোসেন

মূল্য
একশত ষাট টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0093-4

---

BANGLABHASHAR SHERA RUPKATHA
The best fairy tales of Bengali Language
Edited by Ahmad Mazhar
Published by Bishwo Shahitto Kendro
17 Mymensing Road, Banglamotor, Dhaka 1000 Bangladesh
**Email : bskprokashona@gmail.com www.bsksale.com**
**Price : Tk. 160.00 only**

# ভূমিকা

*রূপকথা, উপকথা, Folktales* বা *লোককথা,* ব্রতকথা ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দের অর্থ কি এক? শব্দগুলো কি নেহাতই প্রতিশব্দ মাত্র? নাকি প্রতিটি শব্দেরই এমন কোনো সুস্পষ্ট অর্থ আছে যা অন্যগুলো থেকে আলাদা? এই প্রশ্ন সচেতন পাঠকমাত্রেরই মনে জাগা স্বাভাবিক। অর্থ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলে শব্দগুলোর অর্থের পার্থক্য খুঁজে পাওয়াও কঠিন হবে না।

বাংলা ভাষায় দীর্ঘকাল ধরে রূপকথা এবং উপকথা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বড় বড় পণ্ডিত এমনকি অভিধানকাররাও এর ব্যতিক্রম নন। প্রসঙ্গত ড. মলয় বসুর *বাঙালা সাহিত্যে রূপকথা-চর্চা* গ্রন্থে উল্লেখিত *রূপকথা ও উপকথা* সম্পর্কে কয়েকজন পণ্ডিতের ব্যাখ্যা এখানে উদ্ধৃত করা হল :

> আমরা যে গল্পগুলিকে রূপকথা বলেছি, সেগুলির আরেকটি নামও বহুল প্রচলিত আছে— তা 'উপকথা'। বাঙলা দেশের বহু সংকলক, 'রূপকথা'র গল্পকে 'উপকথা' বলেছেন। বহু কবি, লেখক 'উপকথা' শব্দটিই 'রূপকথা'র পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন। মনে হয়, 'উপকথা' শব্দটি থেকেই 'রূপকথা' এসেছে। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ড. সুকুমার সেন, 'উপকথা' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, "শব্দটির মূলে সংস্কৃত উপ-কথি ধাতু থাকিতে পারে। ... সংস্কৃত শব্দ ধরিলে উপকথা মানে অবান্তর, অপ্রধান অথবা ছোট আখ্যায়িকা বা গল্প। ... উপকথার বিষয় মনোরঞ্জক বিচিত্র ঘটনা। তাহাতে ভূত প্রেত দেব দানব থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণত পুরাণ কাহিনীকে উপকথা বলে না।"
>
> জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাংলা ভাষার অভিধান'-এ বলা হয়েছে : [উপ (গ্রাম্য উচ্চারণে রুপ) > রুপ + কথা = রূপকথা]
>
> হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এও এই সূত্র সমর্থিত হয়েছে। 'উপ'-র স্থানে 'র'-এর আগমে শব্দটি দাঁড়িয়েছে 'রূপকথা'। 'উপকথা' নামক শব্দটি গ্রাম্য উচ্চারণে পরিবর্তিত হয়ে কবে থেকে বাঙালি রসনায় 'রূপকথা' রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে নির্ধারণ করা শক্ত।

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলো বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হবে যে, *লোককথা* বা Folktales, রূপকথা উপকথা ইত্যাদি শব্দ অর্থের দিক থেকে আমাদের দীর্ঘকাল ধরে বিভ্রান্ত করে আসছে। আধুনিক লোকসাহিত্যতত্ত্ববিদ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রথমে এ বিষয়ের অস্পষ্টতা দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। *বাংলা ভাষার সেরা*

*রূপকথা* সংকলন-গ্রন্থের ভূমিকা রচনায় রূপকথার সংজ্ঞা নিরূপণ এবং লোককথার অন্যান্য আঙ্গিকের সঙ্গে পার্থক্য নির্ণয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য নির্দেশিত পথকেই মূলত অনুসরণ করা হয়েছে। রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, লোককথা ইত্যাদির পার্থক্য নিরূপণের সুবিধার্থে বিশিষ্ট লোকসাহিত্যতত্ত্ববিদ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের উক্তি উদ্ধৃত করছি :

> পৃথিবীর সকল দেশেই গল্প বলিবার রীতি প্রচলিত আছে। গল্প শুনিবার আগ্রহ মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। বুদ্ধি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রবৃত্তি ক্রমশ মার্জিত হইয়া নূতন নূতন বিষয়বস্তুর সন্ধান ও নূতনতর উপায়ে তাহাদের পরিবেশন করিবার কৌশল আয়ত্ত করা হইলেও, লোক-সমাজের সাধারণ স্তরে রসগ্রহণের যে একটি সাধারণ মান (Standard) আছে, তাহার উপর লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক দেশেই একটি লৌকিক (Popular) কথাসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে— তাহা প্রত্যেক জাতির লোক-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনার ভিতর দিয়াই লৌকিক কাহিনী বর্ণনা করা হইয়া থাকে; পদ্যের ভিতর দিয়া যাহা প্রকাশ করা হয়, তাহা 'গীতিকা' ও 'এপিক' নামে পরিচিত, গদ্যের ভিতর দিয়া যে কাহিনী প্রকাশ করা হয় ইংরেজিতে তাহাকেই সাধারণভাবে Folk tale বলা হয়। লোক-কথা বলিলে বাংলায় এই কথাটির যথার্থ অনুবাদ হয়, তবে সংক্ষেপে তাহা কেবলমাত্র কথা বলিয়াও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বাংলা *লোককথার* আওতায় আমরা পাই বিচিত্র ধরনের গল্প বা কাহিনী। যেমন *রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা* ইত্যাদি। এ ছাড়া *গীতিকা, কথকতা* ইত্যাদি মাধ্যম বা আঙ্গিক থেকেও আমরা অনেক গল্প বা কাহিনী পেয়ে থাকি। এইসব গল্প বা কাহিনীর মধ্যেও আবার কিছু আঙ্গিকগত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। একই কাহিনীর যুগপৎ গদ্যরূপ ও পদ্যরূপও বিরলদৃষ্ট নয়। যেমন দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার কর্তৃক সংগৃহীত এবং লিখিত *কাঁকনমালা-কাঞ্চনমালা* গল্প ও দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সংগৃহীত কাজলরেখা গীতিকাটির আখ্যানভাগ একই। একটির মাধুর্য তার গীতিরূপের বৈশিষ্ট্যে প্রস্ফুটিত, অন্যটির সৌন্দর্য তার কথারূপের বিন্যাসে বাঙ্ময়। আমাদের বিবেচ্য বিষয় কথারূপের বা গীতিকারূপের বৈশিষ্ট্য নয়, আখ্যানের গুণ। *লোককথা* কী কী গুণের অধিকারী হলে আমরা সেটিকে রূপকথা বলব তা বাংলা লোকসাহিত্য পর্যালোচনা করে নির্ণয় করার চেষ্টা করব।

রূপকথা কী সে কথা ব্যাখ্যার আগে এ কথা বলে নেয়া ভালো যে বাংলায় আমরা যাকে রূপকথা বলি তার কোনো ইংরেজি প্রতিশব্দ নেই। তবে অনেকেই ইংরেজি Fairy tale-ডক রূপকথার ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ করলেই তাঁরা অনুধাবন করতে পারবেন যে Fairy tale শব্দের বাংলা অর্থ দাঁড়ায় 'পরী-কাহিনী'। সুতরাং Fairy tale বাংলা রূপকথা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হতে পারে না। লোকসাহিত্যতত্ত্ববিদ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের সূত্রে আমরা জানতে পারি যে বাংলা রূপকথার একটি যথার্থ জার্মান প্রতিশব্দ পাওয়া

যায়, তা হচ্ছে *Marchen*। ইংরেজিতে লিখিত *Marchen*-এর যে সংজ্ঞা তিনি উদ্ধৃত করেছেন তা প্রাসঙ্গিক বিধায় এখানে পুনরুদ্ধৃত করা হল :

> 'A *Marchen* is a tale of some length involving a succession of motifs of apisodes. It moves in an unreal world without definite locality or definite characters and is filled with the marvellous. In this never-never land humble heroes kill adversaries, succeed to kingdoms, and marry princesses.'

বাংলা রূপকথা'র বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বাংলা রূপকথার ভাষা গীতিমধুর। গীতিকা তো বটেই, সরল অর্থে গদ্যে বা কথকতার আঙ্গিকে উপস্থাপিত রূপকথার ভাষা হয় গীতিধর্মী। সে কারণেই অনেক রূপকথার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে গদ্য-পদ্য উভয়েরই মাধ্যমে। বাংলা ভাষার লোকায়ত রূপকথাগুলো বিশ্লেষণ করলে এর একটি 'সংক্ষিপ্ত আদর্শ' বা 'ছাঁচ' লক্ষ করা যায়। ছাঁচটি কেমন তা নির্দেশের জন্য বাংলা রূপকথা-গবেষক ড. মলয় বসুর শরণ নেয়া হল :

> গল্পের একটি আদর্শ বা ছাঁচ থাকবে, যেমন, কোনো অপুত্রক রাজা কোনো দৈব উপায়ে এক বা একাধিক পুত্র লাভ করবেন। বড় হয়ে সেই রাজপুত্র/রাজপুত্রেরা, ভাগ্যের অন্বেষণে দেশান্তরে যাত্রা করবে। কখনো কখনো রাজপুত্রের সঙ্গে মন্ত্রীপুত্র, সওদাগরপুত্র ও কোটালপুত্রও সঙ্গী হবে। অতঃপর নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে এক দুর্লভ রাজকন্যাকে লাভ করবে। তারপর সেই রাজকন্যার অর্ধেক পিতৃরাজ্য লাভ করে সেইখানেই সুখে-স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করবে, কিংবা সেই রাজকন্যাকে নিজ রাজ্যে নিয়ে এসে বাকি জীবন সুখে অতিবাহিত করবে।
>
> কোনো কোনো রূপকথায় নায়িকা-প্রাধান্যও থাকতে পারে। সেইসব গল্পে মানুষ ও মানুষের কাহিনী প্রাধান্য পাবে। অথচ সেই মানুষের কোনো বিশেষ পরিচয় থাকবে না; সে-সব মানুষ কোন্ দেশের, কী তাদের নাম সে সম্বন্ধে পাঠকের কোনো কৌতূহল থাকবে না।
>
> চরিত্রগত নির্বিশেষত্ব রূপকথার একটি বিশিষ্ট ধর্ম। গল্পের বিষয় বা বিষয়াঙ্গসমূহ সকল দেশের সকল স্তরের মনুষ্য-সমাজের উপর প্রযোজ্য হবে। যে-কোনো অসম্ভব ব্যাপার সেই গল্পে গ্রাহ্য হবে, শ্রোতা বা পাঠকের মনে কোনো প্রশ্ন জাগবে না।
>
> রাক্ষস-রাক্ষসী, দৈত্য-দানো, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, শুক-শারী, পক্ষিরাজ ঘোড়া প্রাধান্য পেলেও, তারা কখনো গল্পের নিয়ন্ত্রক হতে পারবে না।
>
> গল্পে ঐন্দ্রজালিক-ক্রিয়া ও প্রাচীন লোক-বিশ্বাস ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকবে।
>
> রাক্ষসী ও রাজকন্যা, রাক্ষস ও রাজপুত্র গল্পে হবে যথাক্রমে খল নায়িকা ও নায়ক।
>
> গল্পের বিষয়বস্তু কখনো জটিল হবে না।— একটি সরলরেখার মতো গল্প অগ্রসর হয়ে যাবে।
>
> বিষয়ের দিক থেকে 'প্রেমের' পর 'অদৃষ্ট' বা 'নিয়তি' গল্পের প্রধান অবলম্বন হবে।
>
> ঐ গল্পে কেবল নীরস গদ্যের আবৃত্তি মাত্র শোনা যাবে না, বরং অপূর্ব শ্রুতি-সুখকর রসের ব্যঞ্জনা অনুভূত হবে।

ঐ গল্পের ভাষা হবে কাব্যধর্মী— এই ভাষা গীতি ও গদ্যের মধ্যবর্তী রেখা ধরে অগ্রসর হবে। দুটি কথা গদ্যে বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার দুটি কথা পদ্যে এসে যাবে। এই ভাষাকে হতে হবে সরল, মনোমত ও অনুভূতি প্রধান।

গল্পে থাকবে শিশুমনের রোমান্স— যে রোমান্স-প্রিয়তা পরিণত মনকে পরবর্তীকালে উচ্চতর-সাহিত্যের মধ্যে রোমান্সের সন্ধান করতে উদ্দীপ্ত করবে।

গল্পে কখনো কৌতুক-রসের প্রাধান্য থাকবে না।

গল্পে কোনো নীতি বা উপদেশ থাকবে না।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং ড. মলয় বসু বাংলা রূপকথার বৈশিষ্ট্য নিরূপণের যে মানদণ্ড নির্ণয় করেছেন তা মূলত বাংলা লোকসাহিত্যকে ভিত্তি করে। কিন্তু আধুনিকতা— যা বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখাকে— যেমন কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস ইত্যাদিকে সমৃদ্ধ করেছে তা বাংলা *রূপকথা*কেও সমৃদ্ধ করেছে। আধুনিক বাংলাসাহিত্যে এমন কিছু *রূপকথা* রচিত হয়েছে যার কথা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা আবশ্যক। এই ধারারও পথিকৃৎ সাহিত্যের অন্য অনেক শাখার মতোই রবীন্দ্রনাথ। *রূপকথার* লোকায়ত অনুষঙ্গসমূহ রূপান্তরিত করে তিনি উপস্থাপন করেছেন আধুনিক মানুষের জীবনের সত্যকে। তাঁর পথ অনুসরণ করে *রূপকথা* সৃষ্টিতে সফল হয়েছেন ঠাকুর পরিবারেরই আরেক সদস্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১), চলিত বাংলা গদ্যের স্রষ্টা প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬), বাংলা শিশুসাহিত্যের রূপকার সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩), সুকুমার রায়ের ভগ্নী সুখলতা রাও (১৮৮৬-১৯৬৯), আধুনিক কবিতা ও কথাসাহিত্যের অন্যতম সেরা রূপকার প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০) প্রমুখ। এঁদের পরে আবির্ভূত অনেক লেখকই এই ধারার রূপকথার চর্চা করে চলেছেন।

বাংলা লোকসাহিত্য এবং আধুনিক সাহিত্যকে যুগপৎ বিবেচনায় এনে *রূপকথার* সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গেলে বলা যাবে যে *রূপকথা* হচ্ছে সেই ধরনের আখ্যান বা কাহিনী যা মানবজীবনেরই রূপক। এই রূপক মানবজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং মানবজীবনের গভীর সত্যকেই প্রকাশ করে। *রূপকথা* এমন এক রহস্যময় মাধুর্যের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে যা মানব-হৃদয়ের 'গোপন কক্ষে' গিয়ে 'আঘাত করে' এবং 'সেখানকার সুপ্ত নামহীন বাসনাগুলির মধ্যে একটা সাড়া' জাগিয়ে দেয়। *রূপকথা* নির্মাণ করে এক আকাঙ্ক্ষিত পৃথিবী। সে কারণে *রূপকথার* পৃথিবীতে রাজপুত্র পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে এক পলকে চলে যায় এক দেশ থেকে আর-এক দেশে। এখানে পক্ষিরাজ দেখা দেয় কল্পিত দ্রুতযানের প্রতীক হয়ে; রূপকথার বিশ্বে অবলীলায় কথা বলে চাঁদ-সূর্য, পশু-পক্ষী; তারা হয়ে ওঠে মানুষের প্রতীক। সাধারণভাবে দৈত্য, রাক্ষস-খোক্কস ইত্যাদি যেমন হয়ে ওঠে অশুভের ও ধ্বংসকারী শক্তির প্রতীক; তেমনি রাজপুত্র হয় শুভ এবং কল্যাণের প্রতীক।

প্রচলিত লোককথাগুলোর মধ্যে বাঘ, কুমির, শৃগাল, কুকুর, বিড়াল, কাক, চিল, চড়ুই প্রভৃতি পশুপাখিকে নিয়ে রচিত গল্পগুলোকে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য রূপকথা থেকে আলাদা করে সেগুলোকে উপকথা বলাই সমীচীন মনে করেছেন। এ ছাড়া বাঙালির নিজস্ব ধর্মবোধকে অবলম্বন করে যে বিশেষ প্রকৃতির লোককথা গড়ে উঠেছে সেগুলোকে তিনি অভিহিত করেছেন ব্রতকথা নামে। এইসব গল্প মেয়েলি ব্রতকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। বাংলার মেয়েদের এই ব্রতগুলোতে 'স্বর্গ বা মোক্ষ লাভের কামনা প্রকাশ পায় না বরং ঐহিক জীবনের অভাব-অনটন' থেকে 'পরিত্রাণের কামনাই প্রকাশ পায়।' এগুলো *রূপকথা ও উপকথার* মধ্যবর্তী জিনিস— এগুলোর মধ্যে '*রূপকথার* কল্পনার স্পর্শ যেমন দেখা যায়, তেমনি *উপকথার* বাস্তববোধও প্রকাশ' পায়।

বর্তমান সংকলনে এমন কিছু রূপকথা সংকলিত হয়েছে যা বাংলা লোকসাহিত্যের সোনালি সম্পদ। একই রূপকথা-আখ্যানকে একেকজন সংগ্রাহক-লেখক একেকভাবে ভাষারূপ দিয়েছেন বলে আমরা গল্প নির্বাচনের সময় সেগুলোর সেরা রূপায়ণটিকে এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছি।

এই সংকলনের গল্পগুলোর চারিত্র্য বিশ্লেষণ করে গল্পগুলোকে আমরা দুইভাগে বিভক্ত করেছি। 'লোকায়ত রূপকথা' পর্বে লোকসাহিত্যের গল্পগুলোকে বিন্যস্ত করা হয়েছে; 'আধুনিক রূপকথা' পর্বে রাখা হয়েছে লোকায়ত কাহিনীর রূপান্তরিত পরিবর্তিত রূপকথা বা আধুনিক জীবন-সত্য প্রকাশের লক্ষ্যে রচিত রূপকথাগুলোকে।

সংকলনে অন্তর্ভুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী রচিত 'টুনটুনি আর রাজার কথা' গল্পটিকে পূর্বোল্লেখিত সংজ্ঞা অনুসারে পূর্ণাঙ্গ অর্থে রূপকথা বলা না গেলেও গল্পটিতে রূপকথার কমবেশি আবহ রয়েছে বলে এবং রূপকথার গল্পের মুদ্রণরূপের অন্যতম আদি নিদর্শন বলে অন্তর্ভুক্ত হল। সুখলতা রাওয়ের 'লালু ভুলু' গল্পটি গ্রিম ভাইদের গল্পের বাংলা রূপান্তর হওয়া সত্ত্বেও এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এতে বাংলা লোককথার বৈশিষ্ট্য ও বাঙালিত্বের আবহ নিখুঁতভাবে রূপায়িত হয়েছে বলে।

রেভারেন্ড লালবিহারী দে সংকলিত বাংলা ভাষার আদিতম লোককথার সংকলন Folk tales of Bengal থেকে দুটি সেরা রূপকথার গল্পের লীলা মজুমদার-কৃত বাংলা অনুবাদ বর্তমান সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হল বাংলা রূপকথার আদিতম লিখিত রূপ বিবেচনায়। লীলা মজুমদার ইংরেজিতে রূপান্তরিত বাংলা গল্পকে বাংলা ভাষায় ফিরিয়ে এনেছেন রূপকথার গল্প রচনার ক্ষেত্রে চিরায়ত বাংলাভাষার বৈশিষ্ট্যগুলো প্রয়োগ করে।

একটি নির্ভেজাল রূপকথার সংকলন হিসেবে বাংলাভাষার সেরা রূপকথা পাঠকদের আদর পেলে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের উদ্যোগ ও সম্পাদকের শ্রম সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

১০/১ নিউ ইস্কাটন ঢাকা ১২১৭

আহমাদ মাযহার

## সূচি


**লোকায়ত রূপকথা**

**লালবিহারী দে**

১৩ সাত মায়ের এক ছেলে

২০ আগে কথা পরে কাজ

**উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী**

৩৭ টুনটুনি আর রাজার কথা

**দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার**

৬০ পাতাল-কন্যা মণিমালা

৬৭ শীত-বসন্ত

**যোগীন্দ্রনাথ সরকার**

৯০ সাত ভাই চম্পা

**জসীমউদ্‌দীন**

১০৯ ডালিমকুমার

**আধুনিক রূপকথা**

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

তোতাকাহিনী ৩০

সুয়োরানির সাধ ৩৪

**অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

ক্ষীরের পুতুল ৪০

**সুখলতা রাও**

লালু আর ভুলু ৭৯

**সুকুমার রায়**

রাজার অসুখ ৯৪

**শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়**

পরীর চুমু ৯৮

**শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়**

আঙুর-পরী ডালিম-পরী ১০৪

**প্রেমেন্দ্র মিত্র**

অপরূপ-কথা ১২৬

# সাত মায়ের এক ছেলে

লালবিহারী দে

অনেক কাল আগে এক রাজা ছিলেন, তাঁর সাত রানি। কিন্তু তাঁর মনে কোনো সুখ ছিল না। সাত রানির মধ্যে কারো ছেলেপুলে হল না। এমন সময় একজন সাধু এসে রাজাকে বললেন :

'মহারাজ, আপনার মনের দুঃখ আমি জানতে পেরেছি। রাজধানীর উত্তরে যে বিশাল ঘন বন আছে, তার ঠিক মধ্যিখানে এক আমগাছ আছে। এত বড় আমগাছ সচরাচর দেখা যায় না। ওই আমগাছের ডালে সাতটি পাকা আম ঝুলে আছে। মহারাজ যদি ওই বনে গিয়ে, নিজের হাতে ওই সাতটি আম পেড়ে এনে রানিদের খেতে দেন, তাহলে তাঁদের প্রত্যেকের ছেলে হবে।'

রাজা আর অপেক্ষা করলেন না। ঘোড়ায় চড়ে তখনি ওই বনের মধ্যে গিয়ে, সেই আমগাছ থেকে সাতটি আম পেড়ে এনে রানিদের খেতে দিলেন। কিছুদিন পরে রাজা শুনলেন সাত রানির-ই ছেলে হবে। তাঁর মনে আর আনন্দ ধরে না।

এর মধ্যে রাজা একদিন বনে গেছেন শিকার করতে। এমন সময় দেখলেন গাছতলায় এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কারো সঙ্গে পরামর্শ না করে তাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে রাজবাড়িতে ফিরে এলেন। দিনকতক পরে তার সঙ্গে রাজার বিয়ে হয়ে গেল।

ওই সুন্দরী মেয়ে কিন্তু আসলে একটা রাক্ষসী। রাজা তার কিছুই বুঝতে পারেননি। নতুন রানিকে তিনি এতই ভালোবেসে ফেললেন যে সে যা বলত তিনি তাই করতেন।

একদিন নতুন রানি হঠাৎ বলল, 'তুমি যে রোজ বল আমাকে তুমি খুব ভালোবাস, কই, তার প্রমাণ দাও এবার। সত্যিই যদি আমাকে ভালোবাস, তাহলে তোমার আগেকার রানিগুলোর চোখ গেলে, তাদের মেরে ফেল। তবেই বুঝব আমাকে সত্যি ভালোবাস, না হলে ও কথা আর মুখে এন না।'

সবচাইতে আদরের রানির মুখে এমন ভয়ঙ্কর কথা শুনে রাজা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন! কী করে এমন নিষ্ঠুর কাজ তিনি করবেন, বিশেষত রানিদের সকলের ছেলে হবে, এমন সময়? কিন্তু নতুন রানি কিছুতেই ছাড়ল না। তার কথা না রাখলে সে রাজার মুখ দেখবে না বলে শপথ করল। অগত্যা রাজার হুকুমে নিরপরাধ সাত রানির চোখ গেলে, তাদের বধ করবার জন্য মন্ত্রীর হাতে সঁপে দেয়া হল।

কিন্তু মন্ত্রীর মনে দয়ামায়া ছিল, তাই তাঁদের মেরে না ফেলে, নির্জন পাহাড়ের উপরে একটা পাথরের গুহায় লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু সেখানে খাবার-দাবারের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। মন্ত্রীও রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন।

প্রথমে বড় রানির ছেলে হল। তিনি তখন অন্যদের বললেন, 'এই অন্ধ অবস্থায় এ ছেলেকে কী করে মানুষ করব? নিজেরাই তো না খেয়ে মরতে বসেছি। তার চেয়ে ছেলেটাকে মেরে সাতজনে ভাগ করে খাই।' তাই করা হল। ছয় রানি তাঁদের ভাগ খেলেন। ছোট রানি তাঁর ভাগ তুলে রেখে, উপোস করে রইলেন।

এরপর একজনের পর একজন করে আরো পাঁচ রানির ছেলে হল আর তাকে মেরে সকলে মিলে ভাগ করে খেলেন। খালি ছোট রানি প্রত্যেকবার তাঁর ভাগটি তুলে রাখলেন।

সবার শেষে ছোট রানিরও ছেলে হল। তখন বড় রানিরা বললেন, 'দে আমাদের ভাগ দে।'

ছোট রানি মনে মনে স্থির করেছিলেন, যেমন করেই হোক তাঁর ছেলেটির প্রাণ বাঁচিয়ে, তাকে মানুষ করবেন। তিনি তখন তুলে রাখা সেই ছটি টুকরো এনে দিদিদের খেতে দিলেন। তাঁরা দেখলেন এ তো শুকনো খাবার। ছোট রানিকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন :

'দিদি, তোমরা আমার কথা রাখ, ছয় বাছা গেছে, এস সকলে মিলে এই শেষেরটিকে মানুষ করি।' অন্য রানিরা তখনি রাজি হলেন। নিজেদের ছেলে মেরে ফেলতে তাঁদের কম কষ্ট হয়নি।

সাত রানির বুকের দুধ খেয়ে ওই এক ছেলে মানুষ হতে লাগল।

যেমনি তার রূপ-লাবণ্য, তেমনি তার বুদ্ধি, বল, সাহস।

এদিকে রাজবাড়িতে, আর শুধু রাজবাড়িতে কেন, সমস্ত রাজধানীতে মহা-সর্বনাশ ঘনিয়ে এল। রাজা-রানির জন্য রোজ যে চৌষট্টি ব্যঞ্জন ভাত পরিবেশন করা হত, তাতে রাক্ষসীর পেট ভরত না। কাজেই রাতদুপুরে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে রানি আগে একে একে রাজবাড়ির সবকটি মানুষকে সাবাড় করল। তারপর হাতিশালের হাতি, ঘোড়াশালের ঘোড়া, গোয়ালের যতেক গরু, সব শেষ করল। উজির, নাজির, পাত্র, মিত্র, চাকর, দাসী যারা পালাতে পারল না, তাদের কাউকে রাখল না রানি। শেষটা বাকি রইল শুধু রাক্ষসী নিজে আর তার হতভাগ্য স্বামী।

তারপর রাক্ষসী আর কী করে, রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে, এখানে একটা মানুষ ধরে খেয়ে, ওখানে একটা মোষ খেয়ে পেট ভরাতে লাগল।

এ দিকে রাজার অবস্থা কাহিল। একটা চাকর বাকি নেই যে তার সেবা-যত্ন করে, একটা বামুনঠাকুর নেই যে চারটি রেঁধে দেয়। সে দেশের কোনো মানুষ রাজবাড়ির ছায়া মাড়ায় না। প্রজারা সব প্রাণের ভয়ে পালিয়েছে।

ততদিনে ছোটরানির সেই সুন্দর ছেলের ষোল বছর বয়স হয়েছে। যেমন তার বুদ্ধি, তেমনি গায়ের জোর আর মনে সাহস। সাত মায়ের দুঃখের কাহিনী শুনে রাজপুত্র চাকর সেজে, রাজবাড়িতে কাজ নিল। কেউ তার আসল পরিচয় জানতে পারল না। 'কেউ' বলতে তো ওই দুটি প্রাণী, রাজা আর রাক্ষসী। এতদিন পরে একটা কাজের লোক পেয়ে রাজা বড় খুশি। বড় ভালো তাঁর এই নতুন লোকটি; নাম তার শোভন। শোভন সারাদিন রাজার দেখাশুনা করে, তার একটু কষ্ট হতে দেয় না। অনেকদিন পরে রাজা আবার একটু আরাম পেলেন।

এতদিন সাত মায়ের কষ্ট দেখে বাবার ওপর শোভনের ভারি রাগ ছিল। সে ছোটবেলা থেকেই ভাবত বড় হয়েই বাবার ওপর প্রতিশোধ নেবে। এখন প্রতিশোধ নিতে এসে দেখে বাবা বড় দুঃখী। মায়া পড়ে যায়। আর প্রতিশোধ নেওয়া হয় না। শোভন প্রাণ দিয়ে বাবার সেবা করে। কিন্তু রাতে থাকে না।

রাতে থাকা নিরাপদ ছিল না। রাতে রানি রাক্ষসীর রূপ নিয়ে খাবার খুঁজে বেড়াত, দিনের বেলায় কিছু করত না। তাই সূর্য ডোবার আগেই শোভন বাবাকে খাইয়ে-দাইয়ে, ঘর-দোর পরিষ্কার করে, বিছানা পেতে, মশারি ফেলে, মাথার কাছে একতোড়া গোলাপ সাজিয়ে রেখে বাড়ি চলে যেত। রাজা তাকে ছাড়তে চাইতেন না, ওই প্রেতের মতো রাজপুরীতে এতটুকু আনন্দ ছিল না।

শোভনের মন খারাপ হয়ে যেত। বাবাকে একলা ফেলে যেতে মন চাইত না। কিন্তু থাকার উপায় ছিল না। রাক্ষসী তার স্বামীকে কিছু বলবে না, কিন্তু শোভনকে তো আর ছাড়বে না। পাহাড়তলির গাঁ থেকে সাত মায়ের জন্য খাবার কিনে নিয়ে যেত সে। সে যে রাক্ষসপুরীতে কাজ করে তাঁরা টের পেতেন না। পেলে উপোস

করে মরে গেলেও, তাকে ছাড়তেন না! শোভন তাঁদের প্রাণের প্রাণ, অন্ধ চোখের মণি। তাঁরা ভাবতেন বোধহয় দূর-গাঁয়ে কাজ করে, তাই ফিরতে রোজ সন্ধ্যা হয়।

এ দিকে রাক্ষসী ভারি ধূর্ত। রাজার এমন নধর চাকরটাকে দেখে তার জিভে জল আসে! আবার ভয়ও হয়; যে চালাক ছেলে, কেমন রাত হবার আগে রোজ পালায়! কী জানি সে হয়তো তার আসল পরিচয় ধরে ফেলেছে! যেমন করে হোক ছেলেটাকে বিদায় করতে হবে।

যেমন গায়ে জোর, তেমনি খাটতেও পারত শোভন। আবার জোর গলায় বলত, 'আমি কাজে ভয় পাই না। যত কঠিন কাজই হোক না কেন, আমি ঠিক করে দেব।'

রাক্ষসীর মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি এল! সে রাজাকে গিয়ে বলল, 'মহারাজ, আমার কলজের ব্যামো। আমি বোধ হয় আর বাঁচব না। একদিন যদি তুমি তোমার ওই চালাক চাকরটাকে সমুদ্রের অন্যপারে পাঠিয়ে, আমার বুড়ি মায়ের কাছ থেকে, ওঁদের দেশের বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি আনিয়ে দিতে পার, তবেই আমি ভালো হব।'

রাজা দুঃখিত হয়ে বললেন, 'যাও, শোভন, রানির জন্য ওই ওষুধ নিয়ে এস। কিন্তু তুমি ছেলেমানুষ, পারবে তো?' রাক্ষসী বলল, 'আমি মাকে চিঠি লিখে দেব, মা'র কাছেই ওষুধ আছে। খুঁজতেও হবে না। তাছাড়া ছেলেটা তো বলেই যে কাজ যতই কঠিন হোক, ও ঠিক করে দেবে।'

রাক্ষসী মেয়ের রাক্ষসী মা। সে থাকত সমুদ্রের অন্য পারে রাক্ষসদের দেশে। রানি ভাবল সেখানে একবার গেলে, বাছাধনকে আর ফিরতে হচ্ছে না। আমি মাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি, 'এই নাও তোমার জলখাবার পাঠালাম।' মা অমনি ওকে তুলে মুখে পুরে দেবে।

এই ভেবে রাক্ষসী সত্যিসত্যি তাই লিখে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল। এবার ব্যাটার সন্ধ্যার আগে বাড়ি পালানো বেরিয়ে যাবে! সন্ধ্যার আগে সেখান থেকে ফেরা যায় না। একটা রাত কাটাতেই হবে।

সকালে শোভন সাত মায়ের কয়েকদিনের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করে দিয়ে চিঠি নিয়ে রওনা হয়ে গেল। রাজধানী ছাড়িয়ে কিছু দূরে গিয়ে সে চিঠি খুলে পড়ে দেখল। যা সন্দেহ করেছিল, ঠিক তাই। রাক্ষসী লিখেছে, 'মা, তোমাকে জলখাবার পাঠালাম।'

চিঠিটা শোভন ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে, পথ চলতে লাগল। কত দেশ, কত বন, কত পর্বত, কত নদী পার হয়ে, অবশেষে একদিন সে সমুদ্রের তীরে এসে পৌঁছল। ওই সমুদ্রের অন্যপারে রাক্ষসদের দেশ। সাত মায়ের দুধ-খাওয়া ছেলের গলার জোরটি কম

ছিল না। সেই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে সে হাঁক দিল; 'ও দিদিমা-আ! দিদিমা গো— ও— ও! তুমি কোথায় গেলে? এদিকে তোমার মেয়ে যে মরতে বসেছে— এ— এ! শিগরির এসে তোমার নাতিকে নিয়ে যা— আ— আ— ও! আমি ওষুধ নিতে এসেছি!!'

সমুদ্রের অন্য তীর থেকে বুড়ি রাক্ষসী সে ডাক শুনতে পেয়ে, সাগরের উপর দিয়ে শাঁই শাঁই করে উড়ে এসে, নাতিকে পিঠে তুলে আবার শাঁই শাঁই করে ফিরে গেল। শোভন রাক্ষসদের দেশের মাটিতে নামল। নেমেই বুড়িকে বলল,

'কই গো দিদিমা, আমাকে দেখে খুশি হচ্ছ না যে?'

বুড়ি একগাল হেসে শোভনের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল,

'খুশি বলে খুশি, দাদা, খুবই যা চাস আমি তোকে তাই দেব। বল, কোন্‌টা নিবি?'

শোভন বলল, 'বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি কী জান, দিদিমা? সেই একটা নিয়ে গেলে, মা খেয়ে বাঁচবে!'

শুনে বুড়ি গলে জল। 'ওরে আমার সোনারে! ওরে আমার মানিক রে। আমার ভাঁড়ারঘরেই আছে, ধন, এখনি এনে দিচ্ছি।'

বুড়ি তাকে মস্ত এক কাঁকুড় এনে দিল, ফলটার চেয়ে তার বিচিটাই বড়, এমনি আশ্চর্য জিনিস। কাঁকুড় দিয়ে বুড়ি বলল, 'যা, দাদা, মাকে খাওয়াগে যা, তাকে সারিয়ে তোল।'

শোভন বলল, 'আজ তোমার কাছে থাকি দিদিমা, কাল যাব। শরীরটা বড় ক্লান্ত।'

বুড়ি বলল, 'ওমা, এতক্ষণ সে কথা বলতে হয়। আমার ঘরে শো গে যা।'

বুড়ির ঘরের দেয়ালে ঝোলানো ছিল একটা মস্ত মুগুর আর একগাছা শক্ত দড়ি। তাই দেখে শোভন বলল,

'ওগুলো কী, দিদিমা?'

বুড়ি বলল, 'ওর সাহায্যেই তো আমি সাগর পার হই, দাদু। হাতে ওই মুগুর আর দড়ি নিয়ে, যে বলবে,

'হেই শক্ত মুগুর, দড়ি ওরে
দেনা সাগর পার করে!'

অমনি হুশ করে সমুদ্রের ওপারে পৌঁছে যাবে।'

ঘরের কোণে একটা খাঁচা ঝুলছিল, তার মধ্যে এক সবুজ পাখি। শোভন বলল, 'ও দিদিমা, ও কী পাখি?'

বুড়ি বলল, 'ও পাখির কথা কোনো মানুষকে বলতে নেই। তবে তুই যে আমার নিজের নাতি, তোকে বললে দোষ নেই। ওই পাখির বুকে তোর মায়ের প্রাণ। পাখি মরলেই, মা-ও মরবে।'

শোভন সব শুনে রাখল। বুড়ি তারপর পাশে শুয়ে রইল।

ভোরে উঠে অন্য রাক্ষসদের সঙ্গে বুড়ি-ও দূরদেশে চরতে গেল। শোভন তখন খাট থেকে নেমে পাখির খাঁচাটি পাড়ল। তারপর মুগুর নিল, দড়ির গাছাটি নিল। নিয়েই বলল,

'হেই! শক্ত মুগুর, দড়ি ওরে
দেনা সাগর পার করে!'

পলক না ফেলতে শোভন সমুদ্রের অন্যপারে পৌঁছে গেল। তারপর আবার সেই দীর্ঘ পথ পার হয়ে রাজবাড়ির সিং-দরজায় পৌঁছল। ওকে দেখে রাজা খুশি হয়ে ছুটে এলেন, রাক্ষসীও আশ্চর্য হয়ে ছুটে এল। শোভন সেই বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি রাক্ষসীর পায়ের কাছে রাখল। কিন্তু পাখিটিকে নিজের কাপড়-চোপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল।

দু-দিন গেল, চারদিন গেল। তারপর দূর-শহরের প্রজারা এসে রাজাকে বলল:

'মহারাজ, রোজ সন্ধ্যায় রাজবাড়ির দিক থেকে এক আকাশজোড়া প্রকাণ্ড বাজপাখি উড়ে এসে, রাজপথ থেকে মানুষ তুলে খায়। অনেকদিন ধরে এই সর্বনাশ চলছে, মহারাজ, শহর ক্রমে শ্মশান হচ্ছে! যা বিহিত হয়, তাই হুকুম করুন।'

শুনে রাজার মুখ সাদা হয়ে গেল। কী-ই বা করতে পারেন তিনি? আছে কে? এমন সাংঘাতিক পাখির কথা তো তিনি জন্মে শোনেননি।

তখন শোভন এগিয়ে এসে প্রজাদের সামনে দাঁড়িয়ে, রাজাকে বলল:

'মহারাজ, ও পাখি আমি চিনি। রানিমা এসে আপনার পাশে দাঁড়ালে, ও পাখিকে আমি মেরে ফেলতে পারি।'

তখন রাজার হুকুমে রানিকে তাঁর পাশে দাঁড়াতে হল। কাপড়ের ভিতর থেকে শোভন পাখিসুদ্ধ পাখির খাঁচা বের করল। অমনি রাক্ষসীও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

রাজার দিকে ফিরে শোভন বলল,

'এবার দেখুন, মহারাজ, কোন্ পাখি আপনার প্রজা খায়। যেমনই এই পাখির একেকটা অঙ্গ ছিঁড়ব, মানুষখেকো পাখিরও সেই অঙ্গ খসে পড়বে।'

এই বলে শোভন সবুজ পাখিকে খাঁচা থেকে বের করে তার একটা ঠ্যাং ছিঁড়ে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষস-রানিরও একটা পা খসে পড়ল। প্রজারা দেখে তাজ্জব বনে গেল।

তারপর শোভন পাখিটার গলা টিপে, তাকে মেরে ফেলল। অমনি রানিরও প্রাণটা বেরিয়ে গেল।

কারো মুখে কথা সরে না। তখন শোভন সভাস্থ সকলকে বলল, 'আপনারা বসুন, আমি একটা গল্প বলি।' এই বলে সে তার সাত মায়ের নিদারুণ দুঃখের কাহিনী আগাগোড়া বলে গেল। অনেক আগেই রাজার চোখ ফুটেছিল; এখন তিনি কেঁদে আকুল হলেন।

গল্প শেষ করে শোভন বলল, 'মহারাজ, সাত দুঃখিনী মায়ের দুধ খেয়ে মানুষ হওয়া, আমি আপনার সেই ছেলে। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সাত মায়ের কষ্ট দূর করব, আপনাকে মুক্তি দেব। এই আমার কথা রাখলাম।'

রাজা তখন চোখে জল, মুখে হাসি নিয়ে, সিংহাসন থেকে নেমে এসে, ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর শোভনের আর রাজার সঙ্গে, প্রজারা সব দলে দলে বন পেরিয়ে সেই পাহাড়ে উঠতে লাগল, সেখানে পাথরের গুহায় কত কষ্টে সাত অন্ধ রানি দিন কাটাচ্ছিলেন।

বনের মধ্য দিয়ে যাবার সময়, একজন সাধুও ওদের সঙ্গ নিলেন।

এত লোকের কোলাহল শুনে দুঃখিনী রানিরা ভয়ে জড়সড়। শোভন তাঁদের সাহস দিয়ে বলল, 'আমি ফিরে এসেছি মা, বাবাকেও নিয়ে এসেছি।'

অনুতাপে রাজার বুক ফেটে যাচ্ছিল। রানিরা হাতড়ে হাতড়ে গুহা থেকে বেরিয়ে আসছেন, এ দৃশ্য তিনি সইতে পারছিলেন না।

ঠিক সেই সময় সেই সাধু এগিয়ে এসে একে একে সাত রানির মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দৃষ্টি ফিরে পেলেন। তখন সে কী আনন্দ, সে কী বেদনা! সে কী সুখ, সে কী অনুতাপ।

তারি মধ্যে সাধু যে কখন বিদায় নিলেন, আর তাঁকে দেখা গেল না।

রাজা তাঁর রানিদের নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন। জল্লাদরা রাক্ষসীর শরীরটা ততক্ষণে পুঁতে ফেলেছিল। সেই দুঃসময়ের আর কোনো চিহ্নই বাকি ছিল না।

আবার রাজবাড়িতে হাসি শোনা গেল; আবার লোকজনে পুরী গমগম করতে লাগল; নহবৎখানায় নহবৎ বসল। শোভন যুবরাজ হল। মন্ত্রী, কোটাল, পাত্র, মিত্র যারা পালিয়ে বেঁচেছিলেন, সবাই এবার ফিরে এলেন! হাতিশালে হাতি এল, ঘোড়াশালে ঘোড়া এল; গোয়ালভরা গরু এল।

আবার বাগানে ফুল ফুটল, পাখি গাইল।

আমার কথাটি ফুরোল,
নটে গাছটি মুড়োল।

# আগে কথা পরে কাজ

লালবিহারী দে

অনেক অনেক দিন আগে এক রাজা ছিলেন, তাঁর তিন ছেলে। একদিন প্রজারা দল বেঁধে এসে বলল :

'ধর্মাবতার! চোর-ডাকাতের জ্বালায় এ রাজ্যে টেকা দায় হয়ে উঠেছে। আমাদের সামান্য যা সম্পত্তি, তা-ও রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আপনার কাছে এসেছি, যেমন করে হোক, চোর-ডাকাতদের ধরে তাদের উপযুক্ত সাজা দিন।'

এ কথা শুনে রাজা তাঁর ছেলেদের বললেন, 'দেখ, আমি বুড়ো হয়েছি, কিন্তু তোমরা বলিষ্ঠ জোয়ান। আমার রাজ্যে লোকে চোর-ডাকাতের ভয়ে তিষ্ঠুতে পারছে না, এ কী করে সম্ভব হল? আমি আশা করছি তোমরা চোর-ডাকাত ধরে, দেশে নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনবে।'

রাজপুত্ররা ঠিক করলেন সারারাত জেগে রাজধানীর পথে পথে টহল দেবেন। এই মনে করে, নগরের উপকণ্ঠে তাঁরা একট ঘাঁটি করলেন; সেখানে তাঁদের ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র তৈরি থাকবে।

রাতের প্রথম দিকে বড় রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে সমস্ত শহরে চক্কর দিয়ে এলেন, কোথাও কোনো চোর-ডাকাতের চিহ্ন দেখতে পেলেন না। বড় রাজপুত্র ঘাঁটিতে ফিরে এলে পর, মাঝরাতে মেজ রাজপুত্র উঠে ঘোড়ায় চড়ে সমস্ত

শহর ঘুরে কোথাও কোনো চোর-ডাকাতের সাড়া পেলেন না। তিনিও ঘাঁটিতে ফিরে এলেন।

শেষরাত্রে ছোট রাজপুত্র নগর ঘুরতে বেরোলেন। রাজবাড়ির কাছাকাছি যখন পৌঁছেছেন, তখন দেখলেন একজন পরমাসুন্দরী মেয়ে রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে গিয়ে ছোট রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কে? একলা এত রাতে কোথায় যাচ্ছেন?'

তখন সেই সুন্দরী উত্তর দিলেন,

'আমি রাজলক্ষ্মী, এই রাজবাড়ির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আজ রাতে মহারাজ নিহত হবেন, কাজেই আমার এখানকার কাজ ফুরোল। আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

এ কথা শুনে রাজপুত্র হতভম্ব হয়ে গিয়ে, কী যে করা উচিত ভেবে পেলেন না। তারপর একটু চিন্তা করে দেবীকে বললেন,

'কিন্তু ধরুন যদি মহারাজা আজ রাতে না-ই নিহত হলেন, তাহলে আবার ফিরে এসে রাজবাড়িতে বাস করতে আপনার কোনো আপত্তি নেই তো?'

দেবী বললেন, 'তাহলে আমার চলে যাবার কোনো কারণই থাকবে না।'

ছোট রাজপুত্র হাতজোড় করে দেবীর কাছে এই প্রার্থনা করলেন,

'মা, আপনি এখনি চলে যাবেন না। আমি মহারাজের প্রাণ বাঁচাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

দেবীর দয়া হল, তখনি তিনি রাজবাড়িতে ফিরে গেলেন। তাঁর পিছন পিছন ভিতরে ঢুকে কিন্তু ছোট রাজপুত্র কোথাও দেখতে পেলেন না।

আর অপেক্ষা না করে, রাজপুত্র সোজা তাঁর বাবার মহলে গেলেন। রাজা তাঁর সোনার পালঙ্কে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। ঘরের কোণে আরেকটি ছোট খাটে রাজার দ্বিতীয় পক্ষের অল্পবয়সী স্ত্রী ঘুমোচ্ছিলেন। মিটমিট করে একটি প্রদীপ জ্বলছিল। সেই প্রদীপের আলোয় ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য দেখে ছোট রাজপুত্র শিউরে উঠলেন। দেখলেন প্রকাণ্ড একটা কেউটেসাপ রাজার পালঙ্কের চারিদিকে ঘুরছে। রাজপুত্র তাকে দেখবামাত্র দু-টুকরো করে কেটে ফেললেন। তাতেও মন উঠল না। টুকরো দুটোকে শত খণ্ড করে রাজার মস্ত সোনার পানের পাত্রের মধ্যে ভরে রাখলেন।

কিন্তু সাপের গায়ের একফোঁটা রক্ত ছিটকে রানির বুকের উপর পড়ল। ছোট রাজপুত্র তাই দেখে দুর্ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। সাপের রক্তে যদি বিষ থাকে, তাহলে তো বিমাতার প্রাণ যাবে। রাজপুত্র মনে মনে বললেন, 'শেষে কি বাপকে বাঁচাতে গিয়ে মাকে মারলাম!' এখন কী করা যায়? হঠাৎ এক বুদ্ধি এল। নিজের জিবে তাঁর রেশমি চাদর সাত পুরু করে জড়িয়ে নিয়ে রাজপুত্র আস্তে করে রক্তের ফোঁটাটি চেটে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রানির ঘুম ভাঙল। তিনি চোখ খুলেই দেখেন

খাটের পাশে ছোট রাজপুত্র দাঁড়িয়ে, হাতে তলোয়ার। বিমাতাকে চোখ খুলতে দেখে লজ্জা পেয়ে, ছোট রাজপুত্র কিছু না বলে, সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন।

সতিনের ছেলের ওপর রানির বড় রাগ। তিনি ভাবলেন রাজপুত্রের সর্বনাশ করবার এই তো সুযোগ। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। রানি চিৎকার করে উঠলেন। রাজাও ধড়মড় করে উঠে বসলেন!

'কী হল? কী হল, রানি?'

রানি বললেন, 'হবে আবার কী? হঠাৎ ঘুম ভেঙে চোখ খুলে দেখি তোমার আদরের ছোট ছেলে তলোয়ার হাতে আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে। মতলব ওর ভালো নয়। হাজার হোক সেই সর্বনাশীর ছেলে তো। আর এরই না তুমি সুখ্যাতি কর!'

শুনে রাজা স্তম্ভিত। এ দিকে ছোট রাজপুত্র ঘাঁটিতে ফিরে গিয়ে দাদাদের কিছুই বললেন না।

পরদিন ভোরে বড় রাজপুত্রকে ডেকে পাঠালেন রাজা। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যাকে আমি প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে, বিশ্বাস করি, সে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তার কী সাজা পাওয়া উচিত?'

বড় রাজপুত্র বললেন, 'তার গর্দান নেওয়া উচিত মহারাজ। কিন্তু তার আগে দেখা উচিত সে সত্যি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কি না।'

রাজা অবাক হয়ে বললেন,

'তার মানে কী হল?'

বড় রাজপুত্র বললেন, 'তাহলে শুনুন মহারাজ :

সে-কালে এক স্যাকরা ছিল। তার একজন বয়স্ক ছেলে ছিল। সেই ছেলের বউ ছিল, জন্তু-জানোয়ারের ভাষা বুঝতে পারত। কিন্তু তার ওই অসাধারণ বিদ্যার কথা, তার স্বামী কিম্বা আর কেউ-ই জানত না।

একদিন হয়েছে কী, রাতে বউ তার স্বামীর পাশে শুয়ে আছে, হঠাৎ বাড়ির কাছে নদীর ধারে শেয়াল ডেকে উঠল। বউ শুনল শেয়াল বলছে, 'নদীতে একটা মরা ভেসে যাচ্ছে। তার হাতে হীরের আংটি। আহা, কেউ যদি মড়াটা তুলে, আংটিটা খুলে নেয়, তাহলে বাকিটা আমি খাই! হু— হু— হুয়া!'

তাই শুনে বউ আর থাকতে পারল না। চুপি চুপি উঠে, দরজা খুলে নদীর ধারে গেল। কিন্তু তার স্বামীও জেগে ছিল। স্ত্রীকে হঠাৎ উঠে বাইরে যেতে দেখে, তার বড় কৌতূহল হল। সে-ও লুকিয়ে পিছন চলল। বউ নদীর ধারে গেল। স্যাকরার ছেলেও সেখানে গিয়ে, ঝোপের পিছনে লুকিয়ে থেকে এক বীভৎস দৃশ্য দেখল।

নদীতে একটা মরা ভেসে যাচ্ছে; বউ জলে নেমে সেটাকে টেনে তীরের কাছে আনল। এ দিকে মরার আঙুলের হীরের আংটিটা বউ কিছুতেই টেনে খুলতে পারল না। জল লেগে আঙুল ফুলে গেছিল। তখন কী আর করে, দাঁত দিয়ে আঙুলটা কেটে ফেলে, আংটি খুলে নিয়ে বউ বাড়ি ফিরে গেল। মড়াটা ডাঙায় পড়ে রইল।

স্যাকরার ছেলে কিন্তু আসল ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে ভাবল, বউ তবে মানুষ নয়, নিশ্চয়ই কাঁচা-খেকো রাক্ষসী! বউ বাড়ি ফেরার আগেই সেখান থেকে একদৌড়ে বাড়ি গিয়ে, সে ভয়ে কাঠ হয়ে শুয়ে রইল। একটু পরে বউ এসে পাশে শুল।

সারারাত স্যাকরার ছেলের ঘুম হল না। এ-পাশ ও-পাশ করে রাত কাটিয়ে, সকালে আর থাকতে না পেরে, বাবাকে গিয়ে বলল; 'বাবা, এ কেমন মেয়ের সঙ্গে তুমি আমার বিয়ে দিয়েছ? ও তো সত্যিকার মানুষ নয়, ও একটা রাক্ষসী। কাল রাতে ওর পাশে শুয়ে আছি, এমন সময় বাইরে নদীর ধারে বিকট স্বরে শেয়াল ডাকল। বউ ভাবল আমি ঘুমিয়ে আছি। অমনি চুপিচুপি উঠে, দরজা খুলে বেরিয়ে নদীর ধারে গেল।

আমি ভাবলাম এ আবার কী হল! নদীর ধারে যদি কোনো বিপদ হয়। লুকিয়ে লুকিয়ে ওর পিছু নিলাম। ও টের পেল না। নদীর ধারে গিয়ে সে কী বীভৎস দৃশ্য দেখলাম সে আর কী বলব। জলে একটা মরা ভেসে যাচ্ছিল। বউ জলে নেমে, সেটাকে টেনে পাড়ে এনে, খেতে আরম্ভ করে দিল! এ আমার নিজের চোখে দেখা! ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। তখুনি বাড়ি ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে সারারাত ঠকঠক করে কেঁপেছি। একটু পরে ওই বীভৎস খাওয়া শেষ করে, বউ-ও এসে দোর বন্ধ করে, ভালোমানুষের মতো শুয়ে পড়ল।

কিন্তু রাক্ষসীর সঙ্গে আমি কী করে ঘর করি? কোনোদিন না আমাকেও মেরে খেয়ে ফেলে, তাই-বা কে জানে!' এই বিকট গল্প শুনে বুড়ো স্যাকরার চক্ষু স্থির! তখন বাপ-ব্যাটাতে মিলে ঠিক করল বউকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঘোর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে আসতে হবে, যাতে হিংস্র বুনো জানোয়াররা তাকে মেরে খায়। তা ছাড়া আর উপায় নেই।

বউ এ দিকে সকালে উঠে স্নান সেরে, রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধা-বাড়ার জোগাড় করছিল। তার স্বামী এসে বলল, 'আজ আর বেশি কিছু রেঁধো না গো, শুধু একটু বেগুনপোড়া ভাত কর।'

বউকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে, স্যাকরার ছেলে হেসে বলল, 'ও মা, তা-ও জান না; তোমাকে যে আজ বাপের বাড়ি নিয়ে যাব। তোমার মা-বাবা কতকাল তোমায় দেখেননি!'

শুনে বউ আহ্লাদে গদগদ। দেখতে দেখতে বেগুনপোড়া ভাত তৈরি হয়ে গেল। তেল-লঙ্কা দিয়ে তাই খেয়ে বেলা বাড়বার আগেই তারা রওনা হল।

পথে ঘন বন। সেইখানে বউকে ছেড়ে আসার কথা। বুনো জানোয়াররা তাকে খাবে। বনের পথ দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ কানে এল সাপের ফোঁশফোঁশানি! বউ অমনি বুঝতে পারল সাপ বলছে, 'ওগো পথিক! ওই গর্তে একটা ব্যাঙ ডাকছে। গর্তের নিচেটা সোনাদানা মণিমাণিক্যে ঠাসা। যদি ব্যাঙটা আমাকে দিয়ে, সোনাদানাগুলো নিয়ে যাও, তাহলে কী খুশি যে হই!'

এই কথা শুনেই বউ একটা কাঠি দিয়ে ব্যাঙটাকে বের করে ঝোপের মধ্যে ফেলে, গর্তের তলাটা খুঁড়তে লাগল।

তাই দেখে স্যাকরার ছেলের অবস্থা কাহিল। 'এ কী ব্যাপার রে বাবা! এবার আমাকে মেরে খাবে নাকি?'

বউ কিন্তু স্বামীকে ডেকে বলল, 'ওগো এই সোনাদানা মণিমাণিক্যগুলো চাদরে বেঁধে নাও তো দেখি।' স্যাকরার ছেলের বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে গেছিল। ভয়ে ভয়ে তার কাছে গিয়ে তার দু-চোখ কপালে উঠে গেল। গর্তটা সত্যিসত্যি ধনরত্নে ভরা। তখন দুজনে মিলে যতটা পারে ধনরত্ন তুলে পুঁটলি বাঁধল।

এতক্ষণ পরে সাহস পেয়ে স্যাকরার ছেলে বউকে জিজ্ঞাসা করল 'আচ্ছা তুমি কী করে বুঝলে ওখানে সোনাদানা পোঁতা আছে?'

বউ বলল, 'আমি যে জীবজন্তুর ভাষা বুঝি। ওই সাপটা যে ফোঁশফোঁশ করছিল, সে-ই বলেছিল ধনরত্নের কথা।'

তখন স্যাকরার ছেলে মনে মনে বলল, 'তাহলে আমি নিশ্চয় সমস্ত ব্যাপারটা ভুল বুঝেছি। আমার বউয়ের এত বিদ্যে তা তো জানতাম না। এমন স্ত্রী পাওয়া আমার সৌভাগ্য।'

এই ভেবে বউকে বলল 'দেখ, আজ বড় দেরি হয়ে গেল। রাতের আগে তোমার বাপের বাড়ি পৌঁছতে পারব না। এ বনে বড় হিংস্র জানোয়ারের ভয়। চল, আজকের মতো বাড়ি ফিরে যাই।'

বাড়ি পৌঁছতে অনেক সময় লাগল, কারণ মেলা জিনিসপত্র সোনাদানা বয়ে নিয়ে যেতে হল। বাড়ির কাছে পৌঁছে স্যাকরার ছেলে বলল : দেখ, তুমি খিড়কি দিয়ে ঢোক; আমি সামনের দোকানঘরে বাবার সঙ্গে দেখা করে বাবাকে মণিমাণিক্যগুলো দেখিয়ে আনি।'

দুজনে বাড়ির দু-দিক দিয়ে ঢুকল। দুঃখের বিষয়, খিড়কির দোর দিয়ে ঢুকেই বউয়ের বুড়ো শ্বশুরের সঙ্গে দেখা হল। বুড়ো স্যাকরা কোনো কাজে ভিতর-বাড়িতে এসেছিল, তার হাতে ছিল একটা হাতুড়ি। হঠাৎ রাক্ষসী বউয়ের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়াতে, বুড়ো ধরে নিল নিশ্চয় স্বামীকে খেয়ে এবার শ্বশুরকে খেতে এসেছে; অমনি হাতুড়ি তুলে দিয়েছে বউয়ের মাথায় এক বাড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে বউটা মরে গেল। ঠিক সেই সময় তার স্বামীও এসে ঘরে ঢুকে দেখল সর্বনাশ হয়ে গেছে। তখন আর কিছু করার উপায় রইল না।

বড় রাজপুত্র গল্প শেষ করে বললেন, 'অতএব মহারাজ, কারো গর্দান নেবার আগে একবার ভালো করে খবর নেবেন সে সত্যি অপরাধী কি না।'

বড় রাজপুত্রের কথা শুনে বিশেষ চিন্তিত হয়ে রাজা মেজ রাজপুত্রকে ডেকে বললেন, 'যাকে আমি প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে বিশ্বাস করি, সে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে তার কী সাজা পাওয়া উচিত?'

মেজ রাজপুত্র বললেন, 'তার গর্দান যাওয়াই উচিত, এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কারো প্রাণদণ্ড দেবার আগে বিবেচনা করা উচিত সে সত্যি অপরাধী কি না।'

রাজা বললেন, 'তুমি কী বলতে চাও?'

মেজ রাজপুত্র বললেন, 'তাহলে একটা গল্প শুনুন, মহারাজ :

"অনেক দিন আগে এক রাজা ছিলেন, তাঁর ভারি শিকারের শখ। একবার শিকার করতে গেছেন, তাঁর ঘোড়ার কী খেয়াল হল, তাঁকে পিঠে নিয়ে ঘোর জঙ্গলের ভিতরে দৌড় দিল। দেখতে দেখতে সঙ্গীসাথীরা কোথায় পিছনে পড়ে রইল, তাদের আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। কী আর করেন, রাজা, ঘন বনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন, কিন্তু কোথাও কোনো গ্রাম বা নগরের চিহ্ন দেখতে পেলেন না।

এ দিকে তাঁর বেজায় জলতেষ্টা পেয়েছিল, কিন্তু কোনো পুকুর কি হ্রদ, কি নদীও চোখে পড়ল না। এমন সময় দেখেন একটা গাছের উপর থেকে টপটপ করে কী যেন পড়ছে। রাজা ভাবলেন, এ নিশ্চয় বৃষ্টির জল। গাছের কোটরে কী করে জমা হয়েছিল। এই মনে করে একটা ছোট পেয়ালায় করে সেই জল ধরতে লাগলেন।

আসলে ওটা বৃষ্টির জল ছিল না। গাছের উপর প্রকাণ্ড এক কেউটেসাপ রাগের চোটে গাছের গায়ে দাঁত ঘষছিল, আর দাঁত থেকে টপটপ করে বিষ ঝরে পড়ছিল। রাজা কিন্তু ভাবলেন বৃষ্টির জল। যদিও ঘোড়া বুঝেছিল তা নয়। পেয়ালাটা যখন প্রায় ভরে এসেছে রাজা এবার চুমুক দেবেন, তখন প্রভুর প্রাণ বাঁচাবার জন্য ঘোড়াটা হঠাৎ নড়েচড়ে উঠল। ঝাঁকানি লেগে পেয়ালাটা রাজার হাত থেকে পড়ে গেল, জলীয় পদার্থটাও মাটিতে গড়াতে লাগল। রাজার মাথায় খুন চড়ে গেল, অমনি তলোয়ার বের করে লাগালেন ঘোড়ার গলায় এক কোপ! ঘোড়াটা সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল।

তাই বলছিলাম মহারাজ, একটা মানুষের গলা কাটার আগে, সে সত্যি দোষী কি না সেটা তো দেখা দরকার।"

রাজা তখন ছোট রাজপুত্রকে ডেকে বললেন, 'দেখ, যদি কাউকে আমি প্রাণ-মন দিয়ে বিশ্বাস করি আর সে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে তার কী সাজা পাওয়া উচিত?'

ছোট রাজপুত্র বললেন, 'নিঃসন্দেহে তার গর্দান নেওয়া উচিত। তবে তাকে মেরে ফেলার আগে, সে সত্যি বিশ্বাসঘাতক কিনা, সেটা অনুসন্ধান করা উচিত।'

ছোট রাজপুত্র বললেন, 'তাহলে একটা গল্প শুনুন, মহারাজ :

সে কালে এক রাজা ছিলেন, তাঁর প্রাসাদে একটা আশ্চর্য শুকপাখি ছিল। একদিন সেই শুকপাখি মাঠে হাওয়া খেতে গেছে, এমন সময় তার মা-বাপের সঙ্গে দেখা। মা-বাবা বলল,

অনেকদিন বাড়ি আসনি, বাবা। সেখানে সবাই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে। চল, আমাদের সঙ্গে দু-চার দিন থেকে আসবে। কোথায় সমুদ্রের ওপারে দ্বীপের মধ্যিখানে থাকি, যাও-ও না কখনো।'

শুকপাখি বলল, 'মা-বাবা, আমি খুব আনন্দের সঙ্গেই তোমাদের সঙ্গে একবার যাব। তবে রাজার অনুমতি না নিয়ে তো যেতে পারি না। এক কাজ কর; কাল সকালে ঠিক এই জায়গাটিতে এস, আমিও রাজাকে বলে আসব। তারপর রওনা হয়ে যাব!'

শুকপাখিরা কথা বলতে জানে। রাজা তাঁর পোষা পাখিকে বড়ই ভালোবাসতেন, তাই সহজে মত দিতে চাইছিলেন না। শুক অনেক করে বলতে শেষে রাজি হলেন। তারপর মা-বাবার সঙ্গে সমুদ্র পার হয়ে, অনেক দূরের সেই সুন্দর দ্বীপে তার পৈতৃক বাসায় ফিরে গেল।

পনের দিন মা-বাবার সঙ্গে বড় সুখে কাটলে পর শুক গিয়ে মা-বাবাকে বলল,

'মা-বাবা, তোমাদের ভালোবাসা আদর-যত্ন পেয়ে আমি যে কত সুখী তা বলতে পারি না। কিন্তু রাজা আমাকে মাত্র পনের দিনের ছুটি দিয়েছেন। সেই পনের দিন আজ শেষ হল। কাল ভোরে আমাকে আবার রওনা হতে হবে।'

খুব দুঃখ হলেও, এমন ন্যায্য কথায় মা-বাবা আপত্তি করতে পারলেন না। তাঁরা বললেন,

'যাও বাবা, বাধা দেওয়া আমাদের উচিত হবে না। কিন্তু যাবার সময় এখান থেকে রাজার জন্য কোনো ভালো উপহার নিয়ে যাও।'

কী উপহার নেওয়া যায়? অনেক পরামর্শ করার পর তারা স্থির করল যে, ওই দ্বীপে যে অমৃতফলের গাছ আছে, তারি একটি ফল রাজাকে উপহার দেওয়া হবে।

পরদিন ভোরে শুক ঘুম থেকে উঠে, অমৃতফলের গাছ থেকে একটি সুন্দর ফল পেড়ে যত্ন করে ঠোঁটে করে নিয়ে, সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে চলল। ফলটার ওজন ছিল; সেটিকে মুখে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ওড়া সম্ভব হল না। রাত পড়ার আগে রাজার রাজধানীতে পৌঁছানোও গেল না। একটু বনের গাছের ডালে শুক আশ্রয় নিল।

এখন ফলটি নিয়ে করে কী? সারারাত ঠোঁটে করে বসে থাকাও যায় না। যদি ঘুমের মধ্যে ফলটি পড়ে নষ্ট হয়? এমন সময় গাছের ওই ডালেই একটা গর্তের উপর চোখ পড়ল। খুব নিশ্চিন্ত হয়ে, শুক সেই গর্তে ফলটি রেখে দিল।

এ-দিকে হয়েছে কী, ওই গর্তে একটা সাপ থাকত। বাসায় একটা কী বাইরের জিনিস দেখে সাপটা তাতে ছোবল মারল, দাঁত থেকে খানিকটা বিষ ফলের গায়ে লাগল। শুক কিছুই টের পেল না। পরদিন ভোরে আবার ফলটি ঠোঁটে তুলে রওনা হয়ে গেল। যখন রাজধানীতে পৌঁছল, রাজা তখন সভায় বসেছেন।

শুক ফিরে এসেছে দেখে রাজা মহাখুশি। অমন সুন্দর ফল উপহার এনেছে দেখে আরো খুশি। ফলটি দেখতে যেমন সুন্দর খেতেও তেমনি মিষ্টি। সারা পৃথিবীতে এর মতো আর একটিও ফল নেই। এ ফল খেলে মানুষ অমর হয়।

রাজা ফলটি তুলে মুখে দিতে যাবেন, এমন সময় মন্ত্রীরা ব্যস্ত হয়ে বললেন,

'মহারাজ, পাখি যদি ফল না চিনে থাকে? যদি বিষ-ফল হয়?' দেয়ালের উপর একটা কাক বসেছিল। রাজা তার দিকে ফলটি ছুড়ে দিলেন। একটুখানি খাওয়ামাত্র কাকটা মরে পড়ে গেল।

তখন রাজার মাথায় খুন চড়ল। 'কী! এই পাখিকে আমি এত ভালোবেসেছি আর ও কিনা আমাকে মেরে ফেলতে চায়!' এক মুহূর্তও চিন্তা না করে, তলোয়ারের এক কোপে রাজা তাঁর আদরের শুকপাখিকে বধ করলেন।

তারপর রাজার হুকুমে বিষ-ফলের বিচিটা শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে একটা বাগানে পুঁতে ফেলা হল। সেই বিচি থেকে অঙ্কুর বেরোল, শিকড় গজাল, কচি পাতা হল। গাছ বাড়ল, কয়েক মাসের মধ্যে মস্ত হয়ে উঠল, তাতে ফুল ফুটল, চমৎকার দেখতে ফল ধরল।

রাজা তাই দেখে গাছের চারদিকে বেড়া দিয়ে পাহারা বসালেন, যাতে তাঁর প্রজারা কেউ ওই-ফল খেয়ে না মরে।

ওই-শহরে এক বুড়ো ব্রাহ্মণ আর তাঁর স্ত্রী থাকতেন। তাঁরা বড় গরিব, ছেলেপিলেও ছিল না যে বুড়ো বয়সে তাঁদের ভার নেবে। ভিক্ষে করে কোনোরকমে দিন চলত। একদিন ব্রাহ্মণ মনে মনে বললেন,

'এরকম ভিখিরি জীবনের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে। এভাবে বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই। তার চেয়ে বিষ-গাছের ফল খেয়ে মরা ভালো।'

রাত গভীর হলে, ব্রাহ্মণ আস্তে আস্তে উঠে বাইরে গেলেন। ব্রাহ্মণীর মনে মনে ভয় ছিল, দুঃখকষ্ট সইতে না পেরে স্বামী কবে না কী করে বসেন। এখন তাঁকে উঠে যেতে দেখে, তিনিও লুকিয়ে লুকিয়ে পিছু নিলেন।

বিষ-ফলের গাছের চারিদিকের পাহারাদাররা ঘুমিয়ে পড়েছিল। ব্রাহ্মণ বেড়া টপকে ভিতরে গিয়ে একটা ফল পেড়ে, তখনি খেয়ে ফেললেন। তাই দেখে তাঁর স্ত্রী-ও বেড়া ডিঙিয়ে ভিতরে এসে বললেন, 'তুমি মরলে তো আর আমার বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না!' এই বলে তিনিও একটা ফল পেড়ে খেলেন।

বিষ-ফল খেয়েও কিন্তু একটুও শরীর খারাপ হল না। তাঁরা ভাবলেন বোধ হয় ধীরে ধীরে বিষ ধরে। এই মনে করে বাড়ি ফিরে গিয়ে দুজনে শুয়ে পড়লেন। ধরেই নিলেন এই ঘুমই তাঁদের শেষ ঘুম।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই তাঁরা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে, মরে তো যান-ইনি বরং শরীরে খুব তেজ আর বল এসেছে; মনে হচ্ছে বয়সটাও অনেক কমে গেছে।

একটু বাদেই পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা। তারা তো তাঁদের দেখে অবাক! বুড়ো ব্রাহ্মণের পাকা চুল, কোঁচকানো গাল কোথায় উড়ে গেছে। তার জায়গায় জোয়ান ছোকরার মতো চমৎকার চেহারা হয়েছে। তাঁর স্ত্রীর অবস্থাও তাই; দেখে মনে হচ্ছে সুন্দরী তরুণী; রাজবাড়িতেও এমন রূপসী আছে কি না সন্দেহ।

এই আশ্চর্য ব্যাপার রাজার কানে পৌঁছতে দেরি হল না। তিনি ব্রাহ্মণকে ডেকে, তার কাছে সব কথা শুনলেন। তখন তাঁর সমস্ত মন অনুতাপে ভরে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, শুক-কে মারবার আগে তার কাছে সব কথা শোনা উচিত ছিল। তিনি আর দুঃখ রাখার জায়গা পেলেন না।'

গল্প শেষ করে ছোট রাজপুত্র আরো বললেন,

'সেইজন্যই বলেছিলাম মহারাজ, কারো গর্দান নেবার আগে লোকটা বাস্তবিকই অন্যায় কাজ করেছে কি না, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা উচিত। আমি জানি আপনার বিশ্বাস, কাল রাতে আমি কোনো কু-মতলবে আপনার ঘরে ঢুকেছিলাম। কোনো সিদ্ধান্তে আসার আগে আমার কাছে আসল ব্যাপার শুনুন।

আমি কাল রাত্রে রাজপথে টহল দিতে গিয়ে দেখি এক পরমা সুন্দরী মেয়ে রাজবাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন, তিনি এ বাড়ির রাজলক্ষ্মী। রাতে রাজা নিহত হবেন বলে তিনি রাজবাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

আমি তাঁকে বললাম, 'চলে যাবেন না, মা, আপনি ফিরে আসুন। আমি রাজার প্রাণরক্ষা করব।'

তখন তিনি ফিরে এলেন আর আমি আপনার শোবার ঘরে গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড এক কেউটে আপনার সোনার পালঙ্কের চারদিকে ঘুরছে। ওই-সাপকে কেটে সাত টুকরো করে আপনার পানের বাটায় পুরে রেখেছি।

কিন্তু তার গা থেকে একফোঁটা রক্ত ছিটকে রানিমার বুকে পড়েছিল। বড় ভয় হল বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে-না মাকে মেরে ফেললাম! তখন আমি জিভের চারিদিকে

সাতপুরু কাপড় বেঁধে রক্তটা চেটে তুললাম। মা জেগে ভাবলেন আমি বুঝি তাঁর ক্ষতি করতে এসেছি। এই তো হল আসল ব্যাপার। এখনও যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমার মাথা কেটে ফেলেন।'

রাজা তাঁর মাথা না কেটে বুকে জড়িয়ে ধরে, অনেক আদর করলেন। পানের বাটায় সাপের টুকরো দেখে সকলেই বুঝল কী হয়েছিল। সে দিন থেকে ছোট রাজপুত্রের আদর আরো শতগুণে বেড়ে গেল।

আমার কথাটি ফুরোল,
নটে গাছটি মুড়োল।

# তোতাকাহিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক-যে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত, জানিত না কায়দাকানুন কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, 'এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।'

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'পাখিটাকে শিক্ষা দাও।'

২

রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখিটাকে শিক্ষা দিবার।

পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কী।

সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে সে বাসায় বিদ্যা বেশি ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার, ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া। রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুশি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

৩

স্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য যে, দেখিবার জন্য দেশবিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ বলে, 'শিক্ষার একেবারে হদ্দমুদ্দ।' কেহ বলে, 'শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা তো হইল। পাখির কী কপাল!'

স্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বকশিশ পাইল। খুশি হইয়া সে তখনি পাড়ি দিল বাড়ির দিকে।

পণ্ডিত বসিলেন পাখিকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য লইয়া বলিলেন, 'অল্প পুঁথির কর্ম নয়।'

ভাগিনা তখন পুঁথিলিখকদের তলব করিলেন। তারা পুঁথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, 'সাবাস! বিদ্যা আর ধরে না।'

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া। তখনি ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না।

অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই। মেরামত তো লাগিয়াই আছে। তার পরে ঝাড়া মোছা পালিশ-করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, 'উন্নতি হইতেছে।'

লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরও বিস্তর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তনখা পাইয়া সিন্দুক বোঝাই করিল।

তারা এবং তাদের মামাতো খুড়তুড়ো মাসতুতো ভাইরা খুশি হইয়া কোঠা-বালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

৪

সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক আছে যথেষ্ট। তারা বলিল, 'খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না।'

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ভাগিনা, এ কী কথা শুনি!'

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন স্যাকরাদের, পণ্ডিতদের, লিপিকরদের, ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।'

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিলেন, আর তখনি ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল।

৫

শিক্ষা যে কী ভয়ংকর তেজে চলিতেছে, রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র মিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ ঘণ্টা ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া তুরি ভেরী দামামা কাঁসি বাঁশি কাঁসর খোল করতাল মৃদঙ্গ জগঝম্প। পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া,

টিকি নাড়িয়া, মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিস্ত্রি মজুর স্যাকরা লিপিকর তদারকনবিশ আর মামাতো পিসতুতো খুড়তুতো এবং মাসতুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল।

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ কাণ্ডটা দেখিতেছেন!'

মহারাজ বলিলেন, 'আশ্চর্য। শব্দ কম নয়।'

ভাগিনা বলিল, 'শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কম নাই।'

রাজা খুশি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন এমন সময়, নিন্দুক ছিল ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, 'মহারাজ, পাখিটাকে দেখিয়াছেন কি।'

রাজার চমক লাগিল; বলিলেন, 'ওই যা! মনে তো ছিল না। পাখিটাকে দেখা হয় নাই।'

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, 'পাখিকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই।'

দেখা হইল। দেখিয়া বড় খুশি। কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড় যে, পাখিটাকে দেখাই যায় না; মনে হয়, তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন, আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই; কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই, চিৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

এবারে রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কানমলা-সর্দারকে বলিয়া দিলেন, নিন্দুকের যেন আচ্ছা করিয়া কান মলিয়া দেওয়া হয়।

৬

পাখিটা দিনে দিনে ভদ্র-দস্তুর-মতো আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল, বেশ আশাজনক। তবু স্বভাবদোষে সকালবেলার আলোর দিকে পাখি চায় আর অন্যায় রকমে পাখা ঝটপট করে। এমন কি, এক-একদিন দেখা যায়, সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।

কোতোয়াল বলিল, 'এ কী বেয়াদবি।'

তখন শিক্ষামহলে হাপর হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কী দমাদ্দম পিটানি। লোহার শিকল তৈরি হইল, পাখির ডানাও গেল কাটা।

রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, 'এ রাজ্যে পাখিদের কেবল যে আক্কেল নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই।'

তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইয়া এমনি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা।

কামারের পসার বাড়িয়া কামারগিন্নির গায়ে সোনাদানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুঁশিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

৭

পাখিটা মরিল। কোন্‌কালে যে কেউ তার ঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, 'পাখি মরিয়াছে।'

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, 'ভাগিনা, এ কী কথা শুনি।'

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।'

রাজা শুধাইলেন, 'ও কি আর লাফায়।'

ভাগিনা বলিল, 'আরে রাম!'

'আর কি ওড়ে।'

'না।'

'দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়।'

'না।'

রাজা বলিলেন, 'একবার পাখিটাকে আন তো, দেখি।'

পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল।

রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খসখস গজগজ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণহাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

# সুয়োরানির সাধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুয়োরানির বুঝি মরণকাল এল।

তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে, তার কিছুই ভালো লাগছে না। বদ্দি বড়ি নিয়ে এল। মধু দিয়ে মেড়ে বললে, 'খাও।' সে ঠেলে ফেলে দিলে।

রাজার কানে খবর গেল। রাজা তাড়াতাড়ি সভা ছেড়ে এল। পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই?'

সে গুমরে উঠে চললে, 'তোমরা সবাই যাও; একবার আমার স্যাঙাৎনিকে ডেকে দাও।'

স্যাঙাৎনি এল। রানি তার হাত ধরে বললে, 'সই, বস। কথা আছে।'

স্যাঙাৎনি বললে, 'প্রকাশ করে বল।'

সুয়োরানি বললে, 'আমার সাতমহলা বাড়ির এক ধারে তিনটে মহল ছিল দুয়োরানির। তার পরে হল দুটো, তার পরে হল একটা। তার পরে রাজবাড়ি থেকে সে বের হয়ে গেল। তার পরে দুয়োরানির কথা আমার মনেই রইল না।

তার পরে একদিন দোলযাত্রা। নাটমন্দিরে যাচ্ছি ময়ূরপঙ্খি চড়ে। আগে লোক, পিছে লশকর। ডাইনে বাজে বাঁশি, বাঁয়ে বাজে মৃদঙ্গ।

এমন সময় পথের পাশে, নদীর ধারে, ঘাটের উপরটিতে দেখি একখানি কুঁড়েঘর, চাঁপাগাছের ছায়ায়। বেড়া বেয়ে অপরাজিতার ফুল ফুটেছে, দুয়োরের সামনে চালের গুঁড়ো দিয়ে শঙ্খচক্রের আলপনা। আমার ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, 'আহা ঘরখানি কার?' সে বললে, দুয়োরানির।

তার পরে ঘরে ফিরে এসে সন্ধ্যার সময় বসে আছি, ঘরে প্রদীপ জ্বালিনি, মুখে কথা নেই।

রাজা এসে বললে, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই?'

আমি বললেম, 'এ ঘরে আমি থাকব না।'

রাজা বললে, 'আমি তোমার কোঠাবাড়ি বানিয়ে দেব গজদন্তের দেওয়াল দিয়ে। শঙ্খের গুঁড়োয় মেঝেটি হবে দুধের ফেনার মতো সাদা, মুক্তোর ঝিনুক দিয়ে তার কিনারে এঁকে দেব পদ্মের মালা।'

আমি বললেম, 'আমার বড় সাধ গিয়েছে, কুঁড়েঘর বানিয়ে থাকি তোমার বাহির-বাগানের একটি ধারে।'

রাজা বললে, 'আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী।'

কুঁড়েঘর বানিয়ে দিলে। সে ঘর যেন তুলে-আনা বনফুল। যেমনি তৈরি হল অমনি যেন মুষড়ে গেল। বাস করতে গেলেম, কেবল লজ্জা পেলেম।

তার পরে একদিন স্নানযাত্রা।

নদীতে নাইতে গেছি। সঙ্গে একশো-সাতজন সঙ্গিনী। জলের মধ্যে পাল্কি নামিয়ে দিলে, স্নান হল।

পথে ফিরে আসছি, পাল্কির দরজা একটু ফাঁক করে দেখি— ও কোন্ ঘরের বউ গা! যেন নির্মাল্যের ফুল! হাতে সাদা শাঁখা, পরনে লাল-পেড়ে শাড়ি। স্নানের পর ঘড়ায় করে জল তুলে আনছে, সকালের আলো তার ভিজে চুলে আর ভিজে ঘড়ার উপর ঝিকিয়ে উঠছে।

ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, 'মেয়েটি কে, কোন্ দেবমন্দিরে তপস্যা করে?'

ছত্রধারিণী হেসে বললে, 'চিনতে পারলে না? ওই তো দুয়োরানি।'

তার পরে ঘরে ফিরে একলা বসে আছি, মুখে কথা নেই। রাজা এসে বললে, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই?'

আমি বললেম, 'আমার বড় সাধ— রোজ সকালে নদীতে নেয়ে মাটির ঘড়ায় জল তুলে আনব বকুলতলায় রাস্তা দিয়ে।'

রাজা বললে, 'আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী!'

রাস্তায় রাস্তায় পাহারা বসল, লোকজন গেল সরে।

সাদা শাঁখা পরলেম আর লাল-পেড়ে শাড়ি। নদীতে স্নান সেরে ঘড়ায় করে জল তুলে আনলেম। দুয়োরানির কাছে এসে মনের দুঃখে ঘড়া আছড়ে ভাঙলেম। যা ভেবেছিলেম তা হল না, শুধু লজ্জা পেলেম।

তার পরে সেদিন রাসযাত্রা।

মধুবনে জ্যোৎস্নারাতে তাঁবু পড়ল। সমস্ত রাত নাচ হল, গান হল।

পরদিন সকালে হাতির উপর হাওদা চড়ল। পর্দার আড়ালে বসে ঘরে ফিরছি, এমন সময় দেখি বনের পথ দিয়ে কে চলেছে, তার নবীন বয়েস। চূড়ায় তার বনফুলের মালা। হাতে তার ডালি— তাতে শালুক ফুল, তাতে বনের ফল, তাতে ক্ষেতের শাক। ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, 'কোন্ ভাগ্যবতীর ছেলে পথ আলো করেছে?'

ছত্রধারিণী বললে, 'জান না? ওই তো দুয়োরানির ছেলে। ওর মা'র জন্যে নিয়ে চলেছে শালুক ফুল, বনের ফল, ক্ষেতের শাক।'

তার পরে ঘরে ফিরে একলা বসে আছি, মুখে কথা নেই।

রাজা এসে বললে, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই?'

আমি বললেম, 'আমার বড় সাধ— রোজ খাব শালুক ফুল, বনের ফল, ক্ষেতের শাক, আমার ছেলে নিজের হাতে তুলে আনবে।'

রাজা বললে, 'আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী?!

সোনার পালঙ্কে বসে আছি, ছেলে ডালি নিয়ে এল। তার সর্বাঙ্গে ঘাম, তার মুখে রাগ। ডালি পড়ে রইল, লজ্জা পেলেম।

তার পরে আমার কী হল কী জানি।

একলা বসে থাকি, মুখে কথা নেই। রাজা রোজ এসে আমাকে শুধোয়, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই?'

সুয়োরানি হয়েও কী চাই সে কথা লজ্জায় কাউকে বলতে পারিনে। তাই তোমাকে ডেকেছি স্যাঙাৎনি! আমার শেষ কথাটি বলি তোমার কানে— 'ওই দুয়োরানির দুঃখ আমি চাই।'

স্যাঙাৎনি গালে হাত দিয়ে বললে, 'কেন বল তো?'

সুয়োরানি বললে, 'ওর ওই বাঁশের বাঁশিতে সুর বাজল, কিন্তু আমার সোনার বাঁশি কেবল বয়েই বেড়ালেম, আগলে বেড়ালেম, বাজাতে পারলেম না।'

# টুনটুনি আর রাজার কথা

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

রাজার বাগানের কোণে টুনটুনির বাসা ছিল। রাজার সিন্দুকের টাকা রোদে শুকোতে দিয়েছিল, সন্ধ্যার সময় তাঁর লোকেরা একটি টাকা ঘরে তুলতে ভুলে গেল।

টুনটুনি সেই চকচকে টাকাটি দেখতে পেয়ে তার বাসায় এনে রেখে দিলে, আর ভাবল, 'ইস! আমি কত বড়লোক হয়ে গেছি! রাজার ঘরে যে ধন আছে, আমার ঘরে সে ধন আছে!' তারপর থেকে সে খালি এই কথাই ভাবে, আর বলে—

'রাজার ঘরে যে ধন আছে,
টুনির ঘরে সে ধন আছে!'

রাজা তার সভায় বসে সে কথা শুনতে পেয়ে জিগ্যেস করলেন, 'হ্যাঁরে! পাখিটা কী বলছে রে?'

সকলে হাতজোড় করে বলল, 'মহারাজ, পাখি বলছে, আপনার ঘরে যে ধন আছে, ওর ঘরেও নাকি সেই ধন আছে!'

শুনে রাজা খিলখিল করে হেসে বললেন, 'দেখ তো ওর বাসায় কী আছে!'

তারা দেখে এসে বলল, 'মহারাজ, বাসায় একটি টাকা আছে।'

শুনে রাজা বললেন, 'সে তো আমারই টাকা, নিয়ে আয় সেটা।

তখুনি লোক গিয়ে টুনটুনির বাসা থেকে টাকাটি নিয়ে এল। সে বেচারা আর কী করে, সে মনের দুঃখে বলতে লাগল—

'রাজা বড় ধনে কাতর
টুনির ধন নিলে বাড়ির ভিতর!'

শুনে রাজা আবার হেসে বললেন, 'পাখিটা তো বড় ঠ্যাঁটা রে! যা, ওর টাকা ওকে ফিরিয়ে দিয়ে আয়।'

টাকা ফিরে পেয়ে টুনির বড় আনন্দ হয়েছে। তখন সে বলছে—

'রাজা ভারি ভয় পেল
টুনির টাকা ফিরিয়ে দিল।'

রাজা জিগ্যেস করলেন, 'আবার কী বলছে রে?'

সভার লোকেরা বলল, 'বলছে যে মহারাজা নাকি বড্ড ভয় পেয়েছেন, তাই ওর টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন।'

শুনেই তো রাজামশাই রেগে একবারে অস্থির! বললেন, 'কী, এত বড় কথা! আন্ তো ধরে, বেটাকে ভেজে খাই!'

যেই বলা অমনি লোক গিয়ে টুনটুনি বেচারাকে ধরে আনলে। রাজা তাকে মুঠোয় করে নিয়ে বাড়ির ভিতর গিয়ে রানিদের বললেন, 'এই পাখিটাকে ভেজে আজ আমাকে খেতে দিতে হবে।'

বলে তো রাজা চলে এসেছেন, আর রানিরা সাতজনে মিলে সেই পাখিটাকে দেখছেন।

একজন বললেন, 'কী সুন্দর পাখি! আমার হাতে দাও তো একবার দেখি!' বলে তিনি তাকে হাতে নিলেন। তা দেখে আবার একজন দেখতে চাইলেন। তাঁর হাত থেকে যখন আর একজন নিতে গেলেন, তখন টুনটুনি ফসকে গিয়ে উড়ে পালাল।

কী সর্বনাশ! এখন উপায় কী হবে? রাজা জানতে পারলে তো রক্ষা থাকবে না!

এমনি করে তাঁরা দুঃখ করছেন, এমন সময় একটা ব্যাঙ সেইখান দিয়ে থপ থপ করে যাচ্ছে। সাত রানি তাকে দেখতে পেয়ে খপ করে ধরে ফেললেন, আর বললেন, 'চুপ চুপ! কেউ যেন জানতে না পারে! এইটাকে ভেজে দি, আর রাজামশাই খেয়ে ভাববেন টুনটুনিই খেয়েছেন।'

সেই ব্যাঙটার ছাল ছাড়িয়ে তাকে ভেজে রাজামশাইকে দিলে তিনি খেয়ে ভারি খুশি হলেন।

তারপর সবে তিনি সভায় গিয়ে বসেছেন, আর ভাবছেন, 'এবার পাখির বাছাকে জব্দ করেছি!'

অমনি টুনটুনি বলছে—

'বড় মজা, বড় মজা,
রাজা খেলেন ব্যাঙ ভাজা!'

শুনেই তো রাজামশাই লাফিয়ে উঠেছেন! তখন তিনি থুতু ফেলেন, ওয়াক তোলেন, মুখ ধোন, আরও কত কী করেন। তারপর রেগে বললেন, 'সাত রানির নাক কেটে ফেল!'

অমনি জল্লাদ গিয়ে সাত রানির নাক কেটে ফেললে।

তা দেখে টুনটুনি বলল—

'এক টুনিতে টুনটুনাল
সাত রানির নাক কাটাল!'

তখন রাজা বললেন, 'আন্ বেটাকে ধরে! এবারে গিলে খাব! দেখি কেমন করে পালায়!'

টুনটুনিকে ধরে আনলে।

রাজা বললেন, 'আন্ জল!'

জল এল। রাজা মুখ ভরে জল নিয়ে টুনটুনিকে মুখে পুরেই চোখ বুজে ঢক করে গিলে ফেললেন।

সবাই বললে, 'এবার পাখি জব্দ!'

বলতে বলতেই রাজামশাই ভোক করে মস্ত একটা ঢেকুর তুললেন।

সভার লোক চমকে উঠল, আর টুনটুনি সেই ঢেকুরের সঙ্গে বেরিয়ে এসে উড়ে পালাল।

রাজা বললেন, 'গেল, গেল! ধর, ধর!' অমনি দুশো লোক ছুটে গিয়ে বেচারাকে আবার ধরে আনল।

তারপর আবার জল নিয়ে এল, আর সিপাই এসে তলোয়ার নিয়ে রাজামশায়ের কাছে দাঁড়াল, টুনটুনি বেরুলেই তাকে দুই টুকরো করে ফেলবে।

এবার টুনটুনিকে গিলেই রাজামশাই দুই হাতে মুখ চেপে বসে থাকলেন, যাতে টুনটুনি আর বেরুতে না পারে। সে বেচারা পেটের ভিতরে গিয়ে ভয়ানক ছটফট করতে লাগল।

খানিক বাদে রাজামশাই নাক সিটকিয়ে বললেন, 'ওয়াক!' অমনি টুনটুনিকে-সুদ্ধ তাঁর পেটের ভিতরের সকল জিনিস বেরিয়ে এল।

সবাই বলল, 'সিপাই, সিপাই! মারো, মারো! পালাল!'

সিপাই তাতে থতমত খেয়ে তলোয়ার দিয়ে যেই টুনটুনিকে মারতে যাবে, অমনি সেই তলোয়ার টুনটুনির গায়ে না পড়ে রাজামশায়ের নাকে গিয়ে পড়ল। রাজামশাই তো ভয়ানক চ্যাঁচালেন, সঙ্গে সঙ্গে সভার সকল লোক চ্যাঁচাতে লাগল। তখন ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে পটি বেঁধে অনেক কষ্টে রাজামশাইকে বাঁচাল।

টুনটুনি তা দেখে বলতে লাগল—

'নাক-কাটা রাজা রে
দেখ তো কেমন সাজা রে!'

বলেই সে উড়ে সে দেশ থেকে চলে গেল। রাজার লোক ছুটে এসে দেখল, খালি বাসা পড়ে আছে।

# ক্ষীরের পুতুল

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক রাজার দুই রানি— দুয়ো আর সুয়ো। রাজবাড়িতে সুয়োরানির বড় আদর, বড় যত্ন। সুয়োরানি সাতমহল বাড়িতে থাকেন। সাতশো দাসী তাঁর সেবা করে, পা ধোয়ায়, আলতা পরায়, চুল বাঁধে। সাত মালঞ্চের সাত সাজি ফুল, সেই ফুলে সুয়োরানি মালা গাঁথেন। সাত সিন্দুক ভরা সাত রাজার-ধন মানিকের গহনা, সেই গহনা অঙ্গে পরেন। সুয়োরানি রাজার প্রাণ।

আর দুয়োরানি— বড়রানি, তাঁর বড় অনাদর, বড় অযত্ন। রাজা বিষ-নয়নে দেখেন। একখানি ঘর দিয়েছেন— ভাঙাচোরা, এক দাসী দিয়েছেন— বোবা-কালা। পরতে দিয়েছেন জীর্ণ শাড়ি, শুতে দিয়েছেন— ছেঁড়া কাঁথা। দুয়োরানির ঘরে রাজা একটি দিন আসেন, একবার বসেন, একটি কথা কয়ে উঠে যান।

সুয়োরানি— ছোটরানি, তাঁরই ঘরে রাজা বারোমাস থাকেন।

একদিন রাজা রাজমন্ত্রীকে ডেকে বললেন— মন্ত্রী, দেশ-বিদেশ বেড়াতে যাব, তুমি জাহাজ সাজাও।

রাজার আজ্ঞায় রাজমন্ত্রী জাহাজ সাজাতে গেলেন। সাতখানা জাহাজ সাজাতে সাত মাস গেল। ছ'খানা জাহাজে রাজার চাকর-বাকর যাবে, আর সোনার চাঁদোয়া-ঢাকা সোনার জাহাজে রাজা নিজে যাবেন।

মন্ত্রী এসে খবর দিলেন— মহারাজ, জাহাজ প্রস্তুত।

রাজা বললেন— কাল যাব।

মন্ত্রী ঘরে গেলেন।

ছোটরানি— সুয়োরানি রাজ-অন্তঃপুরে সোনার পালঙ্কে শুয়ে ছিলেন, সাত সখী সেবা করছিল, রাজা সেখানে গেলেন। সোনার পালঙ্কে মাথার শিয়রে বসে আদরের ছোটরানিকে বললেন— রানি, দেশ-বিদেশ বেড়াতে যাব, তোমার জন্য কী আনব?

রানি ননীর হাতে হীরের চুড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললেন— হীরের রঙ বড় সাদা, হাত যেন শুধু দেখায়। রক্তের মতো রাঙা আট-আটগাছা মানিকের চুড়ি পাই তো পরি।

রাজা বললেন— আচ্ছা রানি, মানিকের দেশ থেকে মানিকের চুড়ি আনব।

রানি রাঙা পা নাচিয়ে নাচিয়ে, পায়ের নূপুর বাজিয়ে বাজিয়ে বললেন— এ নূপুর ভালো বাজে না। আগুনের বরণ নিরেট সোনার দশগাছা মল পাই তো পরি।

রাজা বললেন— সোনার দেশ থেকে তোমার পায়ের সোনার মল আনব।

রানি গলার গজমতি হার দেখিয়ে বললেন— দেখ রাজা, এ মুক্তো বড় ছোট, শুনেছি কোন দেশে পায়রার ডিমের মতো মুক্তো আছে, তারি একছড়া হার এন।

রাজা বললেন— সাগরের মাঝে মুক্তোর রাজ্য, সেখান থেকে গলার হার আনব। আর কী আনব রানি?

তখন আদরিণী সুয়োরানি সোনার অঙ্গে সোনার আঁচল টেনে বললেন— মা গো, শাড়ি নয় তো বোঝা! আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরফুরে, জলের মতো চিকন শাড়ি পাই তো পরে বাঁচি।

রাজা বললেন— আহা, আহা, তাই তো রানি, সোনার আঁচলে সোনার অঙ্গে ছড় লেগেছে, ননীর দেহে ব্যথা বেজেছে। রানি, হাসিমুখে বিদায় দাও, আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরফুরে, জলের মতো চিকন শাড়ি আনিগে।

ছোটরানি হাসিমুখে রাজাকে বিদায় করলেন।

রাজা বিদায় হয়ে জাহাজে চড়বেন— মনে পড়ল দুখিনী বড়রানিকে।

দুয়োরানি— বড়রানি, ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে কাঁদছেন, রাজা সেখানে এলেন।

ভাঙা ঘরের ভাঙা দুয়ারে দাঁড়িয়ে বললেন— বড়রানি, আমি বিদেশ যাব। ছোটরানির জন্যে হাতের বালা, গলার মালা, পায়ের মল, পরনের শাড়ি আনব। তোমার জন্যে কী আনব? বলে দাও যদি কিছু সাধ থাকে।

রানি বললেন— মহারাজ, ভালোয় ভালোয় তুমি ঘরে এলেই আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়। তুমি যখন আমার ছিলে তখন আমার সোহাগও অনেক ছিল, সাধও অনেক ছিল। সোনার শাড়ি অঙ্গে পরে সাতমহল বাড়িতে হাজার হাজার আলো জ্বালিয়ে সাতশো সখীর মাঝে রানি হয়ে বসবার সাধ ছিল, সোনার পিঞ্জরে শুকশারীর পায়ে সোনার নূপুর পরিয়ে দেবার সাধ ছিল। মহারাজ, অনেক সাধ ছিল, অনেক সাধ মিটেছে। এখন আর সোনার গহনায়, সোনার শাড়িতে কী কাজ? মহারাজ, আমি

কার সোহাগে হীরের বালা হাতে পরব? মোতির মালা গলায় দেব? মানিকের সিঁথি মাথায় বাঁধব? মহারাজ, সেদিন কী আর আছে! তুমি সোনার গহনা দেবে, সে সোহাগ তো ফিরে দেবে না! আমার সে সাতশো দাসী সাতমহল বাড়ি তো ফিরে দেবে না! বনের পাখি এনে দেবে, কিন্তু, মহারাজ, সোনার খাঁচা তো দেবে না! ভাঙা ঘরে সোনার গহনা চোর-ডাকাতে লুটে নেবে, ভাঙা খাঁচায় বনের পাখি কেন ধরা দেবে? মহারাজ, তুমি যাও, যাকে সোহাগ দিয়েছ তার সাধ মেটাও গে, ছাই সাধে আমার কাজ নেই।

রাজা বললেন— না রানি, তা হবে না, লোকে শুনলে নিন্দে করবে। বল তোমার কী সাধ?

রানি বললেন— কোন্ লাজে গহনার কথা মুখে আনব? মহারাজ, আমার জন্যে পোড়ামুখ একটা বাঁদর এন।

রাজা বললেন— আচ্ছা রানি, বিদায় দাও।

তখন বড়রানি— দুয়োরানি ছেঁড়া কাঁথায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে রাজাকে বিদায় দিলেন। রাজা গিয়ে জাহাজে চড়লেন।

সন্ধ্যাবেলা সোনার জাহাজ সোনার পাল মেলে অগাধ সাগরের নীল জল কেটে সোনার মেঘের মতো পশ্চিমমুখে ভেসে গেল।

ভাঙা ঘরে দুয়োরানী নীল সাগরের পারে চেয়ে, ছেঁড়া কাঁথায় পড়ে রইলেন। আর আদরিণী সুয়োরানি সাতমহল অন্তঃপুরে, সাতশো সখীর মাঝে, গহনার কথা ভাবতে ভাবতে, সোনার পিঞ্জরে সোনার পাখির গান শুনতে শুনতে, সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাজাও জাহাজে চড়ে দুঃখিনী বড়রানিকে ভুলে গেলেন। বিদায়ের দিনে ছোটরানির সেই হাসিহাসি মুখ মনে পড়ে আর ভাবেন— এখন রানি কী করছেন? বোধহয় চুল বাঁধছেন। এবার রানি কী করছেন? বুঝি রাঙা পায়ে আলতা পরছেন। এবার রানি কী করছেন? এবার রানি সাত মালঞ্চে ফুল তুলছেন, এবার বুঝি সাত মালঞ্চের সাত সাজি ফুলে রানি মালা গাঁথছেন আর আমার কথা ভাবছেন। ভাবতে ভাবতে বুঝি দুই চক্ষে জল এল, মালা আর গাঁথা হল না। সোনার সুতো, ফুলের সাজি পায়ের কাছে পড়ে রইল; বসে বসে সারা রাত কেটে গেল, রানির চোখে ঘুম এল না।

সুয়োরানি— ছোটরানি রাজার আদরিণী, রাজা তারই কথা ভাবেন। আর বড়রানি রাজার জন্যে পাগল, তাঁর কথা একবার মনেও পড়ে না।

এমনি করে জাহাজে দেশ-বিদেশে রাজার বারো মাস কেটে গেল।

তেরো মাসে রাজার জাহাজ মানিকের দেশে এল।

মানিকের দেশে সকলই মানিক। ঘরের দেওয়াল মানিক, ঘাটের শান মানিক, পথের কাঁকর মানিক। রাজা সেই মানিকের দেশে সুয়োরানির চুড়ি গড়ালেন। আট হাজার মানিকের আটগাছি চুড়ি, পরলে মনে হয় গায়ের রক্ত ফুটে পড়ছে।

রাজা সেই মানিকের চুড়ি নিয়ে, সোনার দেশে এলেন। সেই সোনার দেশে স্যাকরার দোকানে নিরেট সোনার দশগাছা মল গড়ালেন। মল জ্বলতে লাগল যেন আগুনের ফিনকি, বাজতে লাগল যেন বীণার ঝঙ্কার— মন্দিরার রিনি-রিনি।

রাজা মানিকের দেশে মানিকের চুড়ি নিয়ে, সোনার দেশে সোনার মল গড়িয়ে, মুক্তোর রাজ্যে এলেন।

সে দেশে রাজার বাগানে দুটি পায়রা। তাদের মুক্তোর পা, মানিকের ঠোঁট; পান্নার গাছে মুক্তোর ফল খেয়ে মুক্তোর ডিম পাড়ে। দেশের রানি সন্ধ্যাবেলা সেই মুক্তোর মালা গাঁথেন, রাতের বেলায় খোঁপায় পরেন, সকালবেলায় ফেলে দেন।

দাসীরা সেই বাসি মুক্তোর হার এক-জাহাজ রুপো নিয়ে বাজারে বেচে আসে।

রাজা এক-জাহাজ রুপো দিয়ে সুয়োরানির গলায় দিতে সেই মুক্তোর একছড়া হার কিনলেন।

তারপর মানিকের চুড়ি নিয়ে, সোনার দেশে সোনার মল গড়িয়ে, মুক্তোর রাজ্যে মুক্তোর হার গাঁথিয়ে, ছ-মাস পরে রাজা এক দেশে এলেন। সে দেশে রাজকন্যের উপবনে নীল মানিকের গাছে নীল গুটিপোকা নীলকান্ত মণির পাতা খেয়ে— জলের মতো চিকন, বাতাসের মতো ফুরফুরে, আকাশের মতো নীল রেশমের গুটি বাঁধে। রাজার মেয়ে সারারাত ছাদে বসে; আকাশের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে, সেই নীল রেশমে শাড়ি বোনেন। একখানি শাড়ি বুনতে ছ'মাস যায়। রাজকন্যে একটি দিন সেই আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরফুরে, জলের মতো চিকন শাড়ি পরে শিবের মন্দিরে মহাদেব নীলকণ্ঠের পূজা করেন। ঘরে এসে শাড়ি ছেড়ে দেন, দাসীরা যার কাছে সাত-জাহাজ সোনা পায় তার কাছে শাড়ি বেচে। রাজা সাত-জাহাজ সোনা দিয়ে আদরিণী সুয়োরানির শখের শাড়ি কিনলেন।

তারপর আর ছ'মাসে রাজার সাতখানা জাহাজ সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে ছোটরানির মানিকের চুড়ি, সোনার মল, মুক্তোর মালা, সাধের শাড়ি নিয়ে দেশে এল। তখন রাজার মনে পড়ল বড়রানি বাঁদর চেয়েছেন।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন— মন্ত্রীবর, বড় ভুল হয়েছে। বড়রানির বাঁদর আনা হয়নি, তুমি একটা বাঁদরের সন্ধানে যাও।

রাজমন্ত্রী একটা বাঁদরের সন্ধানে চলে গেলেন। আর রাজা শ্বেতহস্তী চড়ে লোকারণ্য রাজপথ দিয়ে, ছোট রানির সাধের গহনা শখের শাড়ি নিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন।

ছোটরানি সাতমহল বাড়ির সাততলার উপরে সোনার আয়না সামনে রেখে, সোনার কাঁকুইয়ে চুল চিরে, সোনার কাঁটা সোনার দড়ি দিয়ে খোঁপা বেঁধে সোনার চেয়াড়িতে সিঁদুর নিয়ে ভুরুর মাঝে টিপ পরছেন, কাজল-লতায় কাজল পেড়ে চোখের পাতায় কাজল পরছেন, রাঙা পায়ে আলতা দিচ্ছেন; সখীরা ফুলের থালা নিয়ে, পানের বাটা নিয়ে রাজরানি ছোটরানির সেবা করছে— রাজা সেখানে এলেন।

স্ফটিকের সিংহাসনে রানির পাশে বসে বললেন— এই নাও, রানি! মানিকের দেশে মানিকের ঘাট, মানিকের বাট— সেখান থেকে হাতের চুড়ি এনেছি। সোনার দেশে সোনার ধুলো, সোনার বালি— সেখান থেকে পায়ের মল এনেছি। মুক্তোর রাজ্যে মুক্তোর পা, মানিকের ঠোঁট, দুটি পাখি মুক্তোর ডিম পাড়ে। দেশের রানি সেই মুক্তোর হার গাঁথেন, রাতের বেলায় খোঁপায় পরেন, ভোরের বেলায় ফেলে দেন। রানি, তোমার জন্যে সেই মুক্তোর হার এনেছি। রানি, এক দেশে রাজার মেয়ে, এক-খী রেশমে সাত-খী সুতো কেটে নিশুতি রাতে ছাদে বসে ছ'টি মাসে একখানি শাড়ি বোনেন, একদিন পরে পুজো করেন, ঘরে এসে ছেড়ে দেন। রানি, আমি সেই রাজার মেয়ের দেশ থেকে সাত জাহাজ সোনা দিয়ে রাজকন্যার হাতে বোনা শাড়ি এনেছি। তুমি একবার চেয়ে দেখ! পৃথিবী খুঁজে গায়ের গহনা, পরনের শাড়ি আনলুম, একবার পরে দেখ!

রানি তখন দুহাতে আটগাছা চুড়ি পরলেন; মানিকের চুড়ি রানির হাতে ঢিলা হল, হাতের চুড়ি কাঁধে উঠল।

রানি তখন দু-পায়ে দশগাছা মল পরলেন; রাঙা পায়ে সোনার মল আলগা হল। দু'পা যেতে দশগাছা মল শাণের উপর খসে পড়ল।

রানি মুখ ভার করে মুক্তোর হার গলায় পরলেন; মুক্তোর দেশের মুক্তোর হার রানির গলায় খাটো হল, হার পরতে গলার মাস কেটে গেল। রানি ব্যথা পেলেন।

সাত-পুরু করে শখের শাড়ি অঙ্গে পরলেন; নীল রেশমের নীল শাড়ি হাতে-বহরে কম পড়ল। রানির চোখে জল এল।

তখন মানিনী ছোটরানি আটহাজার মানিকের আটগাছা চুড়ি খুলে ফেলে, নিরেট সোনার দশগাছা মল পায়ে ঠেলে, মুক্তোর মালা, শখের শাড়ি ধুলোয় ফেলে বললেন— ছাই গহনা! ছাই এ শাড়ি! কোন পথের কাঁকর কুড়িয়ে এ চুড়ি গড়ালে? মহারাজ, কোন্ দেশের ধুলো-বালিতে এ মল গড়ালে? ছি ছি, এ কার বাসি মুক্তোর বাসি হার! এ কোন্ রাজকন্যার পরা শাড়ি! দেখলে যে ঘৃণা আসে, পরতে যে লজ্জা হয়! নিয়ে যাও মহারাজ, এ পরা-শাড়ি পরা-গহনায় আমার কাজ নেই।

রানি অভিমানে গোসা-ঘরে খিল দিলেন। আর রাজা মলিন মুখে সাত জাহাজ সোনা দিয়ে কেনা সেই সাধের গহনা, শখের শাড়ি নিয়ে রাজসভায় এলেন।

রাজমন্ত্রী রাজসিংহাসনের একপাশে— রাজ্যের মাঠ-ঘাট দোকান-পাট সন্ধান করে, জাদুকরের দেশের এক বণিকের জাহাজ থেকে, কানা-কড়ি দিয়ে একটি বাঁদরছানা কিনে বসে আছেন।

রাজা এসে বললেন— মন্ত্রীবর, আশ্চর্য হলুম! মাপ দিয়ে ছোটরানির গায়ের গহনা, পরনের শাড়ি আনলুম, সে শাড়ি, সে গহনা, রানির গায়ে হল না!

তখন সেই বনের বানর রাজার পায়ে প্রণাম করে বলল— বড় ভাগ্যবতী পুণ্যবতী না হলে দেবকন্যের হাতে বোনা, নাগকন্যের হাতে গাঁথা, মায়া-রাজ্যের এ মায়া-গহনা, মায়া-শাড়ি, পরতে পায় না। মহারাজ, রাজভাণ্ডারে তুলে রাখ, যাকে বউ করবে তাকে পরতে দিও।

বানরের কথায় রাজা অবাক হলেন। হাসতে হাসতে মন্ত্রীকে বললেন— মন্ত্রী বানরটা বলে কী? ছেলেই হল না, বউ আনব কেমন করে? মন্ত্রী, তুমি স্যাকরার দোকানে ছোটরানির নতুন গহনা গড়তে দাওগে, তাঁতির তাঁতে রানির নতুন শাড়ি বুনতে দাওগে। এ গহনা, এ শাড়ি, রাজভাণ্ডারে তুলে রাখ; যদি বউ ঘরে আনি তাকে পরতে দেব।

রাজমন্ত্রী স্যাকরার দোকানে ছোটরানির নতুন গহনা গড়াতে গেলেন। আর, রাজা সেই বাঁদর-কোলে বড়রানির কাছে গেলেন।

দুঃখিনী বড়রানি— জীর্ণ আঁচলে পা মুছিয়ে, ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় রাজাকে বসতে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন— মহারাজ, বোসো। আমার এই ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বোসো। আমার আর কী আছে তোমায় বসতে দেব? হায়, মহারাজ, কতদিন পরে তুমি ফিরে এলে, আমি এমনি অভাগিনী তোমার জন্যে ছেঁড়া কাঁথা পেতে দিলুম।

রানির কথায় রাজার চোখে জল এল। ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বসে বড়রানির কোলে বাঁদরছানা দিয়ে বললেন— মহারানি, তোমার এ ছেঁড়া কাঁথা, ভাঙা ঘর; ছোটরানির সোনার সিংহাসন, সোনার ঘরের চেয়ে লক্ষগুণে ভালো। তোমার এ ভাঙা ঘরে আদর আছে, যত্ন আছে, দুটো মিষ্টি কথা আছে; সেখানে তা তো নেই। রানি, সাত জাহাজ সোনায় দিয়ে গায়ের গহনা, পরনের শাড়ি দিয়েছি, ছোটরানি পায়ে ঠেলেছে; আর কানাকড়ি দিয়ে তোমার বাঁদর এনেছি, তুমি আদর করে কোলে নিয়েছ। রানি, আমি আর তোমায় দুঃখ দেব না। এখন বিদায় দাও, আমি আবার আসব রানি। কিন্তু দেখো, ছোটরানি যেন জানতে না পারে। তোমার কাছে এসেছি শুনলে আর রক্ষে রাখবে না! হয় তোমায়, নয়তো আমায়, বিষ খাওয়াবে। রাজা বড়রানিকে প্রবোধ দিয়ে গেলেন। আর বড়রানি সেই ভাঙা ঘরে দুধ-কলা দিয়ে সেই বাঁদরের ছানা মানুষ করতে লাগলেন।

এমনি করে দিন যায়। ছোটরানির সাতমহলে সাতশো দাসীর মাঝে দিন যায়; আর বড়রানির ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বাঁদর-কোলে দিন যায়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলে গেল। বড়রানির যে দুঃখ সেই দুঃখই রইল— মোটাচালের ভাত, মোটাসুতোর শাড়ি আর ঘুচল না। বড়রানি সেই ভাঙা ঘরে দুঃখের দুঃখী, সাথের সাথি বনের বানরকে কোলে নিয়ে; ছোটরানির সাতমহল বাড়ি, সাতখানা ফুলের বাগানের দিকে চেয়ে চেয়ে কাঁদেন। বানর বড়রানিকে যখন দেখে তখনি রানির চোখে জল, একটি দিন হাসতে দেখে না।

একদিন বানর বললে— হ্যাঁ মা, তুই কাঁদিস কেন? তোর কিসের দুঃখ? রাজবাড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে কেন কাঁদিস, মা? ওখানে তোর কে আছে?

রানি বললেন— ওরে বাছা, ওখানে আমার সব আছে। আমার সাতমহল বাড়ি আছে, সাতশো দাসী আছে, সাত সিন্দুক গহনা আছে, সাতখানা মালঞ্চ আছে। আর বাছা, ওই সাতমহল বাড়িতে রাজার ছোটরানি আমার এক সতিন আছে। সেই রাক্ষসী রাজাকে জাদু করে আমার সাতমহল বাড়ি, সাতশো দাসী, সাত সিন্দুক গহনা, কেড়ে নিয়ে ওই ফুলের মালঞ্চে সোনার মন্দিরে সুখে আছে; আমার সর্বস্বধন রাজাকে নিয়ে আমায় পথের কাঙালিনী করেছে। ওরে বাছা, আমার কিসের দুঃখ! আমি রাজার মেয়ে ছিলুম, রাজার বউ হলুম। সাতশো দাসী পেলুম, সাতমহল বাড়ি পেলুম, মনের মতো রাজস্বামী পেলুম। সব পেলুম, তবু কে জানে কার অভিশাপে, চিরদিনে পেলুম না কেবল রাজার কোলে দিতে সোনারচাঁদ রাজপুত্র! হায়, কত জন্মে কত পাপ করেছি, কত লোকের কত সাধে বাদ সেধেছি, কত মায়ের প্রাণে ব্যথা দিয়েছি, তাই এ জন্মে সোনার সংসার সতিনকে দিয়ে, রানির গরবে, স্বামীর সোহাগে, রাজপুত্রের আশায় ছাই দিয়ে পথের কাঙালিনী হয়েছি! বাছারে, বড় পাষাণী তাই এতদিন এত অপমান, এত যন্ত্রণা, বুকে সয়ে বেঁচে আছি!

দুঃখের কথা বলতে বলতে রানির চক্ষের জলে বুক ভেসে গেল। তখন সেই বনের বানর রানির কোলে উঠে বসে চোখের জল মুছে দিয়ে রানিকে বললে— মা, তুই কাঁদিসনে। আমি তোর দুঃখ ঘোচাব, তোর সাতমহল বাড়ি দেব, সাতখানা মালঞ্চ দেব, সাতশো দাসী ফিরে দেব, তোকে সোনার মন্দিরে রাজার পাশে রানি করে কোলে নিতে সোনারচাঁদ ছেলে দেব তবে আমার নাম বাঁদর। আমি যা বলি যদি তা করতে পারিস তবে তোর রাজবাড়িতে যেমন ঐশ্বর্য যেমন আদর ছিল তেমনি হবে।

বানরের কথায় রানির চোখের কোণে জল, ঠোঁটের কোণে হাসি এল। রানি কেঁদে কেঁদে হেসে বললেন— ওরে বাছা, দেবতার মন্দিরে কত বলি দিয়েছি, তীর্থে তীর্থে কত-না পুজো দিয়েছি, তবু একটি রাজপুত্র কোলে পাইনি। তুই কী তপস্যা করে,

কোন দেবতার বরে, বনের বানর হয়ে আমাকে রাজরানি করে রাজপুত্র কোলে এনে দিবি? বাছা থাক, আমার রাজা সুখে থাক, আমার সতিন সুখে থাক,— আমার যে দুঃখ সেই দুঃখই থাক, তোর এ অসাধ্য সাধনে কাজ নেই। রাত হল তুই ঘুম যা।

বানর বললে— না মা, আমার কথা না শুনলে ঘুম যাব না।

রানি বললেন— ওরে তুই ঘুমো, রাত যে অনেক হল! পুব-পশ্চিমে মেঘ উঠল, আকাশভেঙে বৃষ্টি এল, রাজ্য জুড়ে ঘুম এল, তুই আমার ঘুমো। কাল যা বলবি তাই শুনব, আজ তুই ঘুম যা। ভাঙা ঘরে দ্বার দিয়েছি— ঝড় উঠেছে, ঘরের মাঝে কাঁথা পেতেছি— শীত লেগেছে, তুই দুধের বাছা, আমার কোলে, বুকের কাছে, ঘুম যা।

বানর রানির বুকে মাথা রেখে ঘুম গেল। রানি ছেঁড়া কাঁথায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এমনি করে রাত কাটল। ছোটরানির সোনার পালঙ্কে, ফুলের বিছানায়, রাজার পাশে রাত কাটল; আর বড়রানির জলে ঝড়ে, ভাঙা ঘরে, ছেঁড়া কাঁথায় রাত কাটল।

সকাল হল। রাজবাড়িতে প্রহরীখানায় প্রহর বাজল, নাকরাখানায় নহবৎ বাজল, রাজারানির ঘুম ভাঙল।

রাজা সোনার ভৃঙ্গারে স্ফটিকজলে মুখ ধুয়ে, রাজবেশ অঙ্গে পরে, রাজ দরবারে নেবে গেলেন। আর ছোটরানি সোনার পালঙ্কে, ফুলের বিছানায়, ফুলের পাখায় হাওয়া খেতে খেতে পাশ ফিরে ঘুম গেলেন।

আর বড়রানি কী করলেন?

ভাঙা ঘরে সোনার রোদ মুখে পড়ল, রানি উঠে বসলেন। এদিক দেখলেন ওদিক দেখলেন, এপাশ দেখলেন ওপাশ দেখলেন— বানর নেই! রানি এ ঘর খুঁজলেন, ও ঘর খুঁজলেন, ঘরের চাল খুঁজলেন, গাছের ডাল খুঁজলেন— বানর নেই! বড়রানি কাঁদতে লাগলেন।

বানর কোথা গেল?

বানর ভাঙা ঘরে ঘুমন্ত রানিকে একলা রেখে রাত না পোহাতে রাজদরবারে চলে গেল।

রাজা বার দিয়ে দরবারে বসেছেন। চারদিকে সভাসদ মন্ত্রী, দুয়ারে সিপাই-সান্ত্রি, আশেপাশে লোকের ভিড়। রানির বানর সেই লোকের ভিড় ঠেলে সিপাই-সান্ত্রির হাত এড়িয়ে রাজার পায়ে প্রণাম করে বললে— মহারাজ, বড় সুখবর এনেছি, মায়ের আমার ছেলে হবে।

রাজা বললেন— ওরে বানর বলিস কী? এ কথা কি সত্যি? বড়রানি দুয়োরানি তার ছেলে হবে? দেখিস, এ কথা যদি মিথ্যা হয় তো তোকেও কাটব আর তোর মা দুয়োরানিকেও কাটব।

বানর বললে— মহারাজ, সে ভাবনা আমার। এখন আমায় খুশি কর, আমি বিদায় হই।

রাজা গলার গজমোতি হার খুলে দিয়ে বানরকে বিদায় করলেন। বানর নাচতে নাচতে ভাঙা ঘরে দুয়োরানি পড়ে পড়ে কাঁদছেন— সেখানে গেল।

দুয়োরানির চোখের জল, গায়ের ধুলো মুছিয়ে বানর বললে— এই দেখ মা, তোর জন্যে কী এনেছি! তুই রাজার রানি, গলায় দিতে হার পাসনে, কাঠের মালা কিনে পরিস, এই মুক্তোর মালা পর!

রানি বানরের হাতে গজমোতি হার দেখে বললেন— এই হার তুই কোথায় পেলি? এ যে রাজার গলার গজমোতি হার! যখন রানি ছিলুম রাজার জন্যে গেঁথেছিলুম, তুই এ হার কোথা পেলি? বল বানর, রাজা কি এ হার ফেলে দিয়েছেন, রাজপথে কি কুড়িয়ে পেলি?

বানর বললেন— না মা, কুড়িয়ে পাইনি। তোর হাতে গাঁথা রাজার গলায় গজমোতি হার কুড়িয়ে কি পাওয়া যায়?

রানি বললে— তবে কি রাজার ঘরে চুরি করলি?

বানর বললে— ছি ছি মা, চুরি কি করতে আছে! আজ রাজাকে সুখবর দিয়েছি তাই রাজা হার দিয়ে খুশি করেছেন।

রানি বললেন— ওরে বাছা, তুই যে দুঃখীর সন্তান, বনের বানর! ভাঙা ঘরে দুঃখিনীর কোলে শুয়ে, রাজাকে দিতে কী সুখের সন্ধান পেলি যে রাত না পোহাতে রাজবাড়িতে ছুটে গেলি?

বানর বললে— মা আমি স্বপ্ন পেয়েছি আমার যেন ভাই হয়েছে, তোর কোলে খোকা হয়েছে; সেই খোকা যেন রাজসিংহাসনে রাজা হয়েছে। তাই ছুটে রাজাকে খবর দিলুম— রাজামশায়, মায়ের খোকা হবে। তাইতে রাজা খুশি হয়ে গলার হার খুলে দিলেন।

রানি বললেন— ওরে রাজা আজ শুনলেন ছেলে হবে, কাল শুনবেন মিছে কথা! আজ রাজা গলায় দিতে হার দিলেন, কাল যে মাথা নিতে হুকুম দেবেন! হায় হায়, কী করলি? একমুঠো খেতে পাই, একপাশে পড়ে থাকি, তবু বছর গেলে রাজার দেখা পাই, তুই আমার তা-ও ঘোচালি? ওরে তুই কী সর্বনাশ করলি! মিছে খবর কেন রটালি? এ জঞ্জাল কেন ঘটালি?

বানর বললে— মা তোর ভয় কী, ভাবিস কেন? এ দশমাস চুপ করে থাক। সবাই জানুক— বড়রানির ছেলে হবে। তারপর রাজা যখন ছেলে দেখবেন তখন তোর কোলে সোনারচাঁদ ছেলে দেব, তুই রাজাকে দেখাস। এখন চল, বেলা হল, খিদে পেয়েছে।

রানি বললেন— চল বাছা চল, বাটি পুরে জল রেখেছি, গাছের ফল এনেছি, খাবি চল।

রানি ভাঙা পিঁড়েয় বানরকে খাওয়াতে বসলেন।

আর রাজা ছোটরানির ঘরে গেলেন।

ছোটরানি কুস্বপ্ন দেখে জেগে উঠে সোনার পালঙ্কে বসে বসে ভাবছেন, এমন সময় রাজা এসে খবর দিলেন— আরে শুনেছ ছোটরানি, বড়রানির ছেলে হবে! বড় ভাবনা ছিল রাজসিংহাসন কাকে দেব, এতদিনে সে ভাবনা ঘুচল। যদি ছেলে হয় তাকে রাজা করব; আর যদি মেয়ে হয়, তবে তার বিয়ে দিয়ে জামাইকে রাজ্য দেব। রানি, বড় ভাবনা ছিল, এতদিনে নিশ্চিন্ত হলুম।

রানি বললেন— পারিনে বাপু, আপনার জ্বালায় বাঁচিনে, পরের ভাবনা!

রাজা বললেন— সে কি রানি? এমন সুখের দিনে এমন কথা বলতে হয়? রাজপুত্র কোলে পাব, রাজসিংহাসনে রাজা করব, এ কথা শুনে কেউ মুখ-ভার করে? রানি, রাজবাড়িতে সবার মুখে হাসি, তুমি কেন অকল্যাণ কর?

রানি বললেন— আর পারিনে! কার ছেলে রাজা হবে, কার মেয়ে রাজ্য পাবে, কে রাজসিংহাসনে বসবে, এত ভাবনা ভাবতে পারিনে। নিজের জ্বালায় মরি, পরের ছেলে মোলো বাঁচল তার খবর রাখিনে। বাবারে, সকালবেলা বকে বকে ঘুম হল না, মাথা ধরল; যাই নেয়ে আসি।

রাগভরে ছোটরানি আটগাছা চুড়ি, দশগাছা মল ঝমঝমিয়ে একদিকে চলে গেলেন।

রাজার বড় রাগ হল, রাজকুমারকে ছোটরানি পর বললে। রাজা মুখ আঁধার করে বার-মহলে চলে এলেন। রাজা-রানিতে ঝগড়া হল। রাজা আর ছোটরানির মুখ দেখলেন না, বড়রানির ঘরেও গেলেন না— ছোটরানি শুনে যদি বিষ খাওয়ায়, বড়রানিকে প্রাণে মারে! রাজা বার-মহলে একলা রইলেন।

এক মাস গেল, দু-মাস গেল, দুমাস গিয়ে তিন মাস গেল, রাজা-রানির ভাব হল না। ঝগড়ায়-ঝগড়ায় চার মাস কাটল। পাঁচ মাসে দুয়োরানির পোষা বানর রাজার সঙ্গে দেখা করলে। রাজা বললেন— কী হে বানর, খবর কী?

বানর বললে— মহারাজ, মায়ের বড় দুঃখ! মোটা চালের ভাত মুখে রোচে না, মা আমার না খেয়ে কাহিল হলেন।

রাজা বললেন— এ কথা তো আমি জানিনে। মন্ত্রীবর, যাও এখনি সরু চালের ভাত, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন, সোনার থালে সোনার বাটিতে বড়রানিকে পাঠিয়ে দাও। আজ থেকে আমি যা খাই বড়রানিও তাই খাবেন। যাও মন্ত্রী, বানরকে হাজার মোহর দিয়ে বিদায় কর।

মন্ত্রী বানরকে বিদায় করে রান্নাঘরে এলেন। আর রানির বানর মোহরের তোড়া নিয়ে রানির কাছে এল।

রানি বললেন— আজ আবার কোথা ছিলি? এতখানি বেলা হল নাইতে পেলুম না, রাঁধব কখন, খাব কখন?

বানর বললে— মা আর তোকে রাঁধতে হবে না। রাজবাড়ি থেকে সোনার থালায় সোনার বাটিতে সরু চালের ভাত, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন আসবে, তাড়াতাড়ি নেয়ে আয়।

রানি নাইতে গেলেন। বানর একমুঠো মোহর নিয়ে বাজারে গেল। ষোলো থান মোহরে ষোলো জন ঘরামি নিলে, ষোলো গাড়ি খড় নিলে, ষোলো শ বাঁশ নিল। সেই ষোলো শ বাঁশ দিয়ে, ষোলো গাড়ি খড় দিয়ে, ষোলোজন ঘরামি খাটিয়ে, চক্ষের নিমেষে দুয়োরানির বানর ভাঙাঘর নতুন করলে। শোবার ঘরে নতুন কাঁথা পাতলে, খাবার ঘরে নতুন পিঁড়ি পাতলে, রাজবাড়ির ষোলো বামুনে রানির ভাত নিয়ে এল; ষোলো মোহরে বিদায় পেলে।

দুয়োরানি নেয়ে এলেন। এসে দেখলেন— ঘর নতুন! ঘরের চাল নতুন! চালের খড় নতুন! মেঝেয় নতুন কাঁথা! আলনায় নতুন শাড়ি! রানি অবাক হলেন। বানরকে বললেন— বাছা, ভাঙা ঘর দেখে ঘাটে গেলুম, এসে দেখি নতুন ঘর! কেমন করে হল?

বানর বললে— মা, রাজামশায় মোহর দিয়েছেন। সেই মোহরে ভাঙা ঘর নতুন করেছি, ছেঁড়া কাঁথা নতুন করেছি, নতুন পিঁড়ে পেতেছি। তুই সোনার থালে গরম ভাত, সোনার বাটিতে তপ্ত দুধ খাবি চল।

রানি খেতে বসলেন। কতদিন পরে সোনার থালায় ভাত খেলেন, সোনার ঘটিতে মুখ ধুলেন, সোনার বাটায় পান খেলেন, তবু মনে সুখ পেলেন না। রানি রাজভোগ খান আর ভাবেন— আজ রাজা সোনার থালে ভাত পাঠালেন, কাল হয়তো মশানে নিয়ে মাথা কাটবেন।

এমনি করে ভয়ে ভয়ে এক মাস, দু-মাস, তিন মাস গেল। বড়রানির নতুন ঘর পুরনো হল, ঘরের চাল ফুটো হল, চালের খড় উড়ে গেল। বানর রাজার সঙ্গে দেখা করলে।

রাজা বললেন— কী বানর, কী মনে করে?

বানর বললে— মহারাজ, ভয়ে কব না নির্ভয়ে কব?

রাজা বললেন— নির্ভয়ে কও।

বানর বললে— মহারাজ, ভাঙা ঘরে মা আমার বড় দুঃখ পান। ঘরের দুয়োর ফাটা, চালে খড় নেই, শীতে হিম ঘরে আসে। মা আমার গায়ে দিতে লেপ পান না, আগুন জ্বালতে কাঠ পান না, সারারাত শীতে কাঁপেন।

রাজা বললেন— তাইতো! তাইতো! একথা বলতে হয়। বানর তোর মাকে রাজবাড়িতে নিয়ে আয়, আমি মহল সাজাতে বলি।

বানর বললে— মহারাজ, মাকে আনতে ভয় হয়, ছোটরানি বিষ খাওয়াবে।

রাজা বললেন— সে ভয় নেই। নতুন মহলে রানিকে রাখব, মহল ঘিরে গড় কাটাব, গড়ের দুয়ারে পাহারা বসাব, ছোটরানি আসতে পাবে না। সে মহলে বড়রানি থাকবেন, বড়রানির বোবা-কালা দাই থাকবে, আর বড়রানির পোষা ছেলে তুই থাকবি।

বানর বললে— মহারাজ, যাই তবে মাকে আনি।

রাজা বললেন— যাও মন্ত্রী, মহল সাজাও গে।

লক্ষ লক্ষ লোক লাগিয়ে একদিনে বড়রানির নতুন মহল সাজালেন।

দুয়োরানি ভাঙা ঘর ছেড়ে, ছেঁড়া কাঁথা ছেড়ে, সোনার শাড়ি পরে নতুন মহলে এলেন। সোনার পালঙ্কে বসলেন, সোনার থালে ভাত খেলেন, দীন-দুঃখীকে দান দিলেন, রাজ্যে জয় জয় হল; রাগে ছোটরানির সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল।

ডাকিনী ব্রাহ্মণী— ছোটরানির 'মনের কথা', প্রাণের বন্ধু। ছোটরানি বলে পাঠালেন— মনের কথাকে আসতে বল, কথা আছে।

রানি ডেকেছেন— ডাকিনী বুড়ি তাড়াতাড়ি চলে এল।

রানি বললেন— এস ভাই, মনের কথা, কেমন আছ? কাছে বোসো।

ডাকিনী ব্রাহ্মণী ছোটরানির পাশে বসে বললে— কেন ভাই, ডেকেছ কেন? মুখখানি ভার ভার, চোখের কোণে জল, হয়েছে কী?

রানি বললেন— হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ড! সতিন আবার ঘরে ঢুকেছে, সে সোনার শাড়ি পরেছে, নতুন মহল পেয়েছে, রাজার প্রেয়সী রানি হয়েছে! ভিখারিণী দুয়োরানি এতদিনে সুয়োরানির রানি হয়ে রাজমহল জুড়ে বসেছে! বামুন সই, দেখে অঙ্গ জ্বলে গেল, আমায় বিষ দে খেয়ে মরি, সতিনের এ আদর প্রাণে সয় না!

ব্রাহ্মণী বললে— ছি! ছি! সই। ও কথা কি মুখে আনে? কোন দুঃখে বিষ খাবে? দুয়োরানি আজ রানি হয়েছে, কাল ভিখারিণী হবে; তুমি যেমন সুয়োরানি তেমনি থাকবে।

সুয়োরানি বললে— না ভাই, বাঁচতে আর সাধ নেই। আজ বাদে কাল দুয়োরানির ছেলে হবে, সে ছেলে রাজ্য পাবে! লোকে বলবে : আহা, দুয়োরানি রত্নগর্ভা, রাজার মা হল! আর দেখ না, পোড়ামুখী সুয়োরানি মহারাজার সুয়োরানি হল, তবু রাজার কোলে দিতে ছেলে পেলে না! ছি! ছি! অমন অভাগীর মুখ দেখে না, নাম করলে সারাদিন উপোস যায়! ভাই, এ গঞ্জনা প্রাণে সবে না। তুই বিষ দে, হয় আমি খাই, নয়তো সতিনকে খাওয়াই।

ব্রাহ্মণী বললে— চুপ কর রানি, কে কোন দিকে শুনতে পাবে। ভাবনা কী? চুপিচুপি বিষ এনে দেব, দুয়োরানিকে খেতে দিও। এখন বিদায় দাও, বিষের সন্ধানে যাই।

রানি বললেন— যাও ভাই। কিন্তু দেখো, বিষ যেন আসল হয়, খেতে-না-খেতে বড়রানি ঘুরে পড়বে।

ডাকিনী বললে— ভয় নেই গো, ভয় নেই! আজ বাদে কাল বড়রানিকে বিষ খাওয়াব, জন্মের মতো মা হবার সাধ ঘোচাব, তুমি নির্ভয়ে থাক।

ডাকিনী বিষের সন্ধানে গেল। বনে বনে খুঁজে খুঁজে ভরসন্ধ্যাবেলা ঝোপের আড়ালে ঘুমন্ত সাপকে মন্ত্রে বশ করে, তার মুখ থেকে কালকূট বিষ এনে দিল।

ছোটরানি সেই বিষে মুগের নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ, মতিচুর মেঠাই গড়ালেন। একখানা থালা সাজিয়ে ডাকিনী ব্রাহ্মণীকে বললেন— ভাই এক কাজ কর, এই বিষের নাড়ু বড়রানিকে বেচে আয়।

ব্রাহ্মণী থালা হাতে বড়রানির নতুন মহলে গেল।

বড়রানি বললেন— আয় লো আয়, এতদিন কোথায় ছিলি? দুয়োরানি বলে কি ভুলে থাকতে হয়?

ডাকিনী বললে— সে কী গো! তোমাদের খাই, তোমাদের পরি, তোমাদের কী ভুলতে পারি? এই দেখ, তোমার জন্যে যতন করে মুগের নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ, মতিচুর মেঠাই এনেছি।

রানি দেখলেন, বুড়ি ব্রাহ্মণী বড় যত্ন করে, থালা সাজিয়ে সামগ্রী এনেছে। খুশি হয়ে তার দু-হাতে দু-মুঠো মোহর দিয়ে বিদায় করলেন, ব্রাহ্মণী হাসতে হাসতে চলে গেল।

রানি ক্ষীরের ছাঁচ ভেঙে খেলেন, জিবের স্বাদ গেল। মুগের নাড়ু মুখে দিলেন, গলা কাঠ হল। মতিচুর মেঠাই খেলেন, বুক যেন জ্বলে গেল। বানরকে ডেকে বললেন— ব্রাহ্মণী আমায় কী খাওয়ালে! গা-কেমন করছে, বুঝি আর বাঁচব না।

বানর বললে— চল মা, খাটে শুবি, অসুখ সারবে।

রানি উঠে দাঁড়ালেন, সাপের বিষ মাথায় উঠল। রানি চোখে আঁধার দেখলেন, মাথা টলে গেল, সোনার প্রতিমা শাণের উপর ঘুরে পড়লেন।

বানর রানির মাথা কোলে নিলে, হাত ধরে নাড়ি দেখলে, চোখের পাতা খুলে চোখ দেখলে— রানি অজ্ঞান, অসাড়।

বানর সোনার প্রতিমা বড়রানিকে সোনার খাটে শুইয়ে দিয়ে ওষুধের সন্ধানে বনে ছুটে গেল। বন থেকে কে জানে কী লতাপাতা, কোন গাছের কী শিকড় এনে নতুন শিলে বেটে বড়রানিকে খাওয়াতে লাগল।

রাজবাড়িতে খবর গেল— বড়রানি বিষ খেয়েছেন। রাজা উঠতে-পড়তে রানির মহলে এলেন। রাজমন্ত্রী ছুটতে ছুটতে সঙ্গে এলেন। রাজবৈদ্য মন্তর আওড়াতে আওড়াতে তারপর এলেন। তারপর রাজার লোক-লস্কর, দাসী-বাঁদী যে সেখানে ছিল হাজির হল।

বানর বললে— মহারাজ, এত লোক কেন এনেছ? আমি মাকে ওষুধ দিয়েছি, মা আমার ভালো আছেন, একটু ঘুমোতে দাও। এত লোককে যেতে বল।

রাজা বিষের নাড়ু পরখ করিয়ে রাজবৈদ্যকে বিদায় করলেন। রাজ্যের ভার দিয়ে রাজমন্ত্রীকে বিদায় করলেন। বড়রানির মহলে নিজে রইলেন।

তিন দিন, তিন রাত বড়রানি অজ্ঞান। চার দিনে জ্ঞান হল, বড়রানি চোখ মেলে চাইলেন।

বানর রাজাকে এসে খবর দিলে— মহারাজ, বড়রানি সেরে উঠেছেন, তোমার একটি রাজচক্রবর্তী ছেলে হয়েছে।

রাজা বানরকে হীরের হার খুলে দিয়ে বললেন— চল বানর, বড়রানিকে আর বড়রানির ছেলেকে দেখে আসি।

বানর বললে— মহারাজ, গণনা করেছি ছেলের মুখ এখন দেখলে তোমার চক্ষু অন্ধ হবে। ছেলের বিয়ে হলে মুখ দেখ, এখন বড়রানিকে দেখে এস ছোটরানি কী দুর্দশা করেছে।

রাজা দেখলেন— বিষের জ্বালায় বড়রানির সোনার অঙ্গ কালি হয়ে গেছে, রানি পাতাখানার মতো পড়ে আছেন, রানিকে আর চেনা যায় না!

রাজা রাজবাড়িতে এসে ছোটরানিকে প্রহরীখানায় বন্ধ করলেন, আর ডাকিনী বুড়িকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে, উলটো গাধায় চড়িয়ে দেশের বার করে দিলেন।

তারপর হুকুম দিলেন— মন্ত্রীবর, আজ বড় শুভদিন, এতদিন পরে রাজচক্রবর্তী ছেলে পেয়েছি। তুমি পথে পথে আলো জ্বালাও, ঘরে ঘরে বাজি পোড়াও, দীন-দুঃখী ডেকে রাজভাণ্ডার লুটিয়ে দাও, রাজ্যে যেন একটিও ভিখারি না থাকে।

মন্ত্রী রাজার আজ্ঞায় নগরের পথে পথে আলো দিলেন, ঘরে ঘরে বাজি পোড়ালেন, দীন-দুঃখীকে রাজভাণ্ডার লুটিয়ে দিলেন, রাজ্যে জয়-জয়কার হল।

এমনি করে নিত্যনতুন আমোদে, দেবতার মন্দিরে পূজা দিয়ে, মা কালীর পায়ে বলি দিয়ে দেখতে দেখতে দশ বৎসর কেটে গেল।

রাজা বানরকে ডেকে বললেন— দশ বৎসর তো পূর্ণ হল এখন ছেলে দেখাও!

বানর বললে— মহারাজ, আগে ছেলের বউ ঠিক কর, তারপর তার বিয়ে দাও, তারপর মুখ দেখ! এখন ছেলে দেখলে অন্ধ হবে।

রাজা বানরের কথায় দেশ-বিদেশে ভাট পাঠালেন। কত দেশের কত রাজকন্যার সন্ধান এল, একটিও রাজার মনে ধরল না। শেষে পাটলী দেশের রাজার ভাট সোনার কৌটায় সোনার প্রতিমা রাজকন্যার ছবি নিয়ে এল! কন্যার অঙ্গের বরণ কাঁচা সোনা, জোড়া-ভুরু— বাঁকাধনু, দুটি চোখ টানা টানা, দুটি ঠোঁট হাসি হাসি, এলিয়ে দিলে মাথার কেশ পায়ে পড়ে। রাজার সেই কন্যা পছন্দ হল।

বানরকে ডেকে বললেন— ছেলের বউ ঠিক করেছি, কাল শুভদিনে শুভলগ্নে বিয়ে দিতে যাব।

বানর বললে— মহারাজ, কাল সন্ধ্যাবেলা বেহারা দিয়ে বরের পালকি মায়ের দুয়ারে পাঠিয়ে দিও, বরকে নিয়ে বিয়ে দিতে যাব।

রাজা বললেন— দেখো বাপু, দশ বৎসর তোমার কথা শুনেছি, কাল ছেলে না-দেখালে অনর্থ করব।

বানর বললে— মহারাজ, সে ভাবনা নেই। তুমি বেহাইবাড়ি চলে যাও, আমরা কাল বর নিয়ে যাব।

রাজা পাছে রানির ছেলেকে দেখে ফেলেন, পাছে চক্ষু অন্ধ হয়, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি বেহাইবাড়ি চলে গেলেন।

আর বানর নতুন মহলে বড়রানির কাছে গেল।

বড়রানি ছেলের বিয়ে শুনে অবধি পড়ে পড়ে কাঁদছেন আর ভাবছেন— ছেলে কোথা পাব, এবার রাজাকে কী ছলে ভোলাব!

বানর এসে বললে— মা গো মা, ওঠ। চেলীর জোড় আন, মাথার টোপর আন, ক্ষীরের ছেলে গড়ে দে, বর সাজিয়ে বিয়ে দিয়ে আনি।

রানি বললেন— বাছারে, প্রাণে কি তোর ভয় নেই? কোন সাহসে ক্ষীরের পুতুল বর সাজিয়ে বিয়ে দিতে যাবি? রাজাকে কী ছলে ভোলাবি? বাছা কাজ নেই, ছল করে রাজার প্রেয়সী হলুম, সেই পাপে সতিন বিষ খাওয়ালে, ভাগ্যে ভাগ্যে বেঁচে উঠেছি, আবার কোন সাহসে রাজার সঙ্গে ছল করব? বাছা ক্ষান্ত দে, কেন আর পাপের বোঝা বাড়াস! তুই রাজাকে ডেকে আন, আমি সব কথা খুলে বলি।

বানর বললে— রাজাকে পাব কোথা? দু'দিনের পথ কনের বাড়ি, রাজা সেখানে গেছেন। তুই কথা রাখ, ক্ষীরের বর গড়ে দে। রাজা পথ চেয়ে আছেন কখন বর আসবে, বর না এলে বড় অপমান। মা তুই ভাবিসনে, ক্ষীরের পুতুল বিয়ে দিতে পাঠালি, যদি ষষ্ঠীর কৃপা হয় তবে ষষ্ঠীদাস ষেঠের বাছা কোলে পাবি।

রানি বানরের ভরসায় বুক বেঁধে মনের মতো ক্ষীরের ছেলে গড়লেন। তাকে চেলীর জোড় পরালেন, সোনার টোপর পরালেন, জরির জুতো পায়ে দিলেন।

বানর চুপিচুপি ক্ষীরের বর পালকিতে তুলে রঙিন ঢাকা নামিয়ে দিলে, বরের কেবল দু'খানি ছোট পা, দু'পাটি জরির জুতো দেখা যেতে লাগল।

ষোলো জন কাহার বরের পালকি কাঁধে তুললে। বানর মাথায় পাগড়ি, কোমরে চাদর বেঁধে, নিশেন উড়িয়ে, ঢাক বাজিয়ে, আলো জ্বালিয়ে, ক্ষীরের পুতুলের বিয়ে দিতে গেল। রানি আঁধার-পুরে একলা বসে বিপদভঞ্জন বিঘ্নহরণকে ডাকতে লাগলেন।

এদিকে বর নিয়ে ষোলো কাহার, মশাল নিয়ে মশালধারী, ঢাকঢোল নিয়ে ঢাকী ঢুলি, ঘোড়ায় চড়ে বরযাত্রী— সারারাত বাঁশি বাজিয়ে, আলো জ্বালিয়ে, ঘোড়া হাঁকিয়ে দিগনগরে এসে পড়ল।

দিগনগরে দিঘির ধারে ভোর হল। মশাল পুড়ে-পুড়ে নিবে গেল, ঘোড়া ছুটে ছুটে বেদম হল, কাহার পালকি বয়ে হয়রান হল, ঢাক পিটে পিটে ঢাকীর হাতে খিল ধরল।

বানর দিঘির ধারে তাঁবু ফেলতে হুকুম দিলে। দিঘির ধারে ষষ্ঠীতলায় বরের পালকি নামিয়ে কাহারদের ছুটি দিলে, মন্ত্রীকে ডেকে বলে দিলেন— মন্ত্রীমশায়, রাজার হুকুম বরকে যেন কেউ না দেখে, আজকের দিনে বর দেখলে বড় অমঙ্গল।

মন্ত্রী রাজার হুকুম জারি করলেন। রাজার লোকজন দিঘির জলে নেয়ে, রেঁধে-বেড়ে খেয়ে, তাঁবুর ভিতর শুয়ে রইল, বটগাছের দিকে এল না। গাঁয়ের বউ-ঝি ষষ্ঠীঠাকরুনের পুজো দিতে এল, রাজার পাহারা হাঁকিয়ে দিলে।

সেদিন বটতলায় ষষ্ঠীঠাকুরুনের পুজো হল না। ষষ্ঠীঠাকুরুন খিদের জ্বালায় অস্থির হলেন, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হল। বানর মনে মনে হাসতে লাগল।

এমনি বেলা অনেক হল। ষষ্ঠীঠাকরুনের মুখে জলবিন্দু পড়ল না, ঠাকরুন কাঠামোর ভিতর ছটফট করতে লাগলেন, ঠাকরুনের কালো বেড়াল মিউ মিউ করে কাঁদতে লাগল। বানর তখন মনে মনে ফন্দি এঁটে পালকির দরজা খুলে রেখে আড়ালে গেল।

ষষ্ঠীঠাকরুন ভাবলেন— আহ আপদ গেল! কাঠফাটা রোদে কাঠামো থেকে বার হয়ে নৈবেদ্যের ছোলাটা কলাটা সন্ধান করতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে দেখেন, পালকির ভিতর ক্ষীরের পুতুল। ঠাকরুন আর লোভ সামলাতে পারলেন না, মনে মনে ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসিকে স্মরণ করলেন।

দিগনগরের যখন দিন, ঘুমের দেশে তখন রাত। ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি সারারাত দিগনগরে ষষ্ঠীরদাস ষেঠের-বাছা ছেলেদের চোখে ঘুম দিয়ে, সকালবেলা ঘুমের দেশে রাজার মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে, অনেক বেলায় একটুখানি চোখ বুজেছেন। এমন সময় ষষ্ঠীঠাকরুনের ডাক পড়ল। ঘুমের দেশে ঘুমপাড়ানি মাসি জেগে উঠলেন,

ঘুমপাড়ানি পিসি উঠে বসলেন, দুই বোনে ঘুমের দেশ ছেড়ে দিগনগরে এলেন। ষষ্ঠীর পায়ে প্রণাম করে বললেন— ঠাকরুন, দিনে-দুপুরে ডেকেছেন কেন?

ঠাকরুন বললেন— বাছারা, এতখানি বেলা হল এখনো ভোগ পাইনি। তোরা একটি কাজ কর, দেশের যে যেখানে আছে ঘুম পাড়িয়ে দে, আমি ডুলির ভিতর ক্ষীরের পুতুলটি খেয়ে আসি।

ষষ্ঠীঠাকরুনের কথায় মাসি-পিসি মায়া করলেন, দেশের লোক ঘুমিয়ে পড়ল। মাঠের মাঝে রাখাল, ঘরের মাঝে খোকা, খোকার পাশে খোকার মা, খেলাঘরে খোকার দিদি ঘুমিয়ে পড়ল। ষষ্ঠীতলায় রাজার লোকজন, পাঠশালায় গাঁয়ের ছেলেপিলে ঘুমিয়ে পড়ল। রাজার মন্ত্রী হুঁকোর নল মুখে ঘুমিয়ে পড়লেন, গাঁয়ের গুরু বেত হাতে ঢুলে পড়লেন। দিগনগরে দিনে-দুপুরে রাত এল। মাসি-পিসি সবার চোখে ঘুম দিলেন— জেগে রইল গাঁয়ের মাঝে রাস্তার শেয়াল-কুকুর, দিঘির ধারে রাজার হাতি-ঘোড়া, বনের মাঝে বনের পাখি, গাছের ডালে রানির বানর। আর জেগে রইল ষষ্ঠীরদাস বনের বেড়াল, জলের বেড়াল, গাছের বেড়াল, ঘরের বেড়াল। ষষ্ঠীঠাকরুন তখন ডুলি খুলে ক্ষীরের ছেলে হাতে নিলেন। ক্ষীরের গন্ধে গাছ থেকে কাঠবেড়াল নেমে এল, বন থেকে বনবেড়াল ছুটে এল, জল থেকে উদবেড়াল উঠে এল, কুনোবেড়াল কোণ ছেড়ে ষষ্ঠীতলায় চলে এল।

ষষ্ঠীঠাকরুন ক্ষীরের ছেলের দশটি আঙুল বেড়ালদের খেতে দিলেন। নিজের ক্ষীরের হাত, ক্ষীরের পা, ক্ষীরের বুক পিঠ মাথা খেয়ে, ক্ষীরের দুটি কান মাসি-পিসির হাতে দিয়ে বিদায় করলেন।

মাসি-পিসি ঘুমের দেশে চলে গেলেন, দিগনগরে দিঘির ঘাটে বরযাত্রীর ঘুম ভাঙল, গাঁয়ের ভিতর ঘরে ঘরে গ্রামবাসীর ঘুম ভাঙল। ষষ্ঠীঠাকরুন তাড়াতাড়ি মুখ মুছে কাঠামোয় ঢুকতে যাবেন, এমন সময় বানর গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে বললে— ঠাকরুন, পালাও কোথা, আগে ক্ষীরের ছেলে দিয়ে যাও! চুরি করে ক্ষীর খাওয়া ধরা পড়েছে, দেশ-বিদেশে কলঙ্ক রটাব।

ঠাকরুন ভয় পেয়ে বললেন— আহ মর! এ মুখপোড়া বলে কী! সর সর, আমি পালাই, লোকে আমায় দেখতে পাবে।

বানর বললে— তা হবে না, আগে ছেলে দাও তবে ছেড়ে দেব। নয়তো কাঠামোসুদ্ধ আজ তোমায় জলে ডুবিয়ে যাব, দেবতা হয়ে ক্ষীর চুরির শাস্তি হবে।

ঠাকরুন লজ্জায় মরে গেলেন, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন— বাছা চুপ কর্। কে কোন্ দিকে শুনতে পাবে? তোর ক্ষীরের ছেলে খেয়ে ফেলেছি ফিরে পাব কোথা? ওই বটতলায় আমার ছেলেরা খেলা করছে, তোর যেটিকে পছন্দ সেটিকে নিয়ে বিয়ে দিগে যা, আমার বরে দুওরানী তাকে আপনার ছেলের মতো দেখবে, এখন আমায় ছেড়ে দে।

বানর বললে— কই ঠাকরুন, বটতলায় তো ছেলেরা নেই। আমায় দিব্যচক্ষু দাও তবে তো ষষ্ঠীরদাস ষেঠের বাছাদের দেখতে পাব। ষষ্ঠীঠাকরুন বানরের চোখে হাত বোলালেন, বানরের দিব্যচক্ষু হল।

বানর দেখলে— ষষ্ঠীতলা ছেলের রাজ্য, সেখানে কেবল ছেলে— ঘরে ছেলে, বাইরে ছেলে; জলে স্থলে, পথে ঘাটে, গাছের ডালে, সবুজ ঘাসে যেদিকে দেখে সেই দিকেই ছেলের পাল, মেয়ের দল। কেউ কালো, কেউ সুন্দর, কেউ শ্যামলা। কারো পায়ে নূপুর, কারো কাঁকালে হেলে, কারো গলায় সোনার দানা। কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে, কেউ ঝুমঝুমি ঝুমঝুম করছে, কেউ-বা পায়ের নূপুর বাজিয়ে কচি হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। কারো পায়ে লাল জুতুয়া, কারো মাথায় রাঙা টুপি, কারো গায়ে ফুলদার লক্ষ টাকার খলমলি চাদর। কোনো ছেলে রোগা রোগা, কোনো ছেলে মোটাসোটা, কেউ দস্যি, কেউ লক্ষ্মী। একদল কাঠের ঘোড়া টকবক হাঁকাচ্ছে, একদল দিঘির জলে মাছ ধরছে, একদল বাঁধের জলে নাইতে নেমেছে, একদল গাছের তলায় ফুল কুড়োচ্ছে, একদল গাছের ডালে ফল পাড়ছে; চারিদিকে খেলাধুলো, মারামারি, হাসিকান্না। সে এক নতুন দেশ, স্বপ্নের রাজ্য! সেখানে কেবল ছুটোছুটি, কেবল খেলাধুলো; সেখানে পাঠশালা নেই, পাঠশালের গুরু নেই, গুরুর হাতে বেত নেই। সেখানে আছে দিঘির কালো জল, তার ধারে শর-বন, তেপান্তর মাঠ। তার পরে আম-কাঁঠালের বাগান, গাছে গাছে ন্যাজঝোলা টিয়েপাখি, নদীর জলে গোল-চোখ বোয়ালমাছ, কচুবনে মশার ঝাঁক। আর আছেন বনের ধারে বনগাঁ-বাসী মাসি-পিসি— তিনি খৈয়ের মোয়া গড়েন, ঘরের ধারে ডালিমগাছটি তাতে প্রভু নাচেন। নদীর পারে জম্ভী-গাছটি তাতে জম্ভী ফল ফলে— সেখানে নীল ঘোড়া মাঠে মাঠে চরে বেড়াচ্ছে, গৌড় দেশের সোনার ময়ূর পথে-ঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে। ছেলেরা সেই নীল ঘোড়া নিয়ে, সেই সোনার ময়ূর দিয়ে ঘোড়া সাজিয়ে, ঢাক-মৃদঙ-ঝাঁঝর বাজিয়ে, ডুলি চাপিয়ে, কমলাফুলির দেশে পুঁটুরানির বিয়ে দিতে যাচ্ছে। বানর কমলাফুলির দেশে গেল। সে টিয়েপাখির দেশ, সেখানে কেবল ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়েপাখি, তারা দাঁড়ে বসে ধান খোঁটে, গাছে বসে কেঁচমেচ করে, আর সে দেশের ছেলেদের নিয়ে খেলা করে। সেখানে লোকেরা গাই-বলদে চাষ করে, হিরে দিয়ে দাঁত ঘষে! সে এক নতুন দেশ— সেখানে নিমেষে সকাল, পলকে সন্ধ্যা হয়, সে দেশের কাণ্ডই এক! ঝুরঝুরে বালির মাঝে চিকচিকে জল, তারি ধারে একপাল ছেলে দোলায় চেপে ছ-পণ কড়ি গুণতে গুণতে মাছ ধরতে এসেছে; কারো পায়ে মাছের কাঁটা ফুটেছে, কারো চাঁদমুখে রোদ পড়েছে। জেলেদের ছেলে জাল মুড়ি দিয়ে ঘুম দিচ্ছে— এমন সময় টাপুর-টুপুর বিষ্টি এল, নদীতে বান এল; অমনি সেই ছেলের পাল, সেই কাঠের দোলা, সেই ছ-পণ কড়ি

ফেলে, কোন পাড়ায় কোন ঘরের কোণে ফিরে গেল। পথের মাঝে তাদের মাছগুলো চিলে কেড়ে নিলে, কোলা ব্যাঙে ছিপগুলো টেনে নিলে, খোকাবাবুরা ক্ষিপ্ত হয়ে ঘরে এলেন, মা তপ্ত দুধ জুড়িয়ে খেতে দিলেন। আর সেই চিকচিকে জলের ধারে ঝুরঝুরে বালির চরে শিবঠাকুর এসে নৌকা বাঁধলেন, তাঁর সঙ্গে তিন কন্যে— এক কন্যে রাঁধলেন বাড়লেন, এক কন্যে খেলেন আর এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি গেলেন। বানর তার সঙ্গে বাপের বাড়ির দেশে গেল। সেখানে জলের ঘাটে মেয়েগুলো নাইতে এসেছে, কালো কালো চুলগুলো ঝাড়তে লেগেছে। ঘাটের দু'পাশে দুই রুই-কাতলা ভেসে উঠল, তার একটি গুরুঠাকুর নিলেন, আর একটি নায়ে-ভরা দিয়ে টিয়ে আসছিল সে নিলে। তাই দেখে ভোঁদড় টিয়েকে এক হাতে নিয়ে আর মাছকে এক হাতে নিয়ে নাচতে আরম্ভ করলে। ঘরের দুয়ারে খোকার মা খোকাবাবুকে নাচিয়ে নাচিয়ে বললেন— ওরে ভোঁদর ফিরে চা, খোকার নাচন দেখে যা।

বানর দেখলে— ছেলেটি বড় সুন্দর, যেন সোনার চাঁদ, তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে কেড়ে নিলে! অমনি ষষ্ঠীতলার সেই স্বপ্নের দেশ কোথায় মিলিয়ে গেল, ন্যাজঝোলা টিয়েপাখি আকাশ সবুজ করে কোন দেশে উড়ে গেল, শিবঠাকুরের নৌকা কোন দেশে ভেসে গেল। ঘাটের মেয়েরা ডুরে শাড়ি ঘুরিয়ে পরে চলে গেল। ষষ্ঠীর দেশে কুনোবেড়াল কোমর বেঁধে, শাশুড়ি ভোলাতে উড়কি ধানের মুড়কি নিয়ে, চার মিনসে কাহার নিয়ে, চার মাগী দাসী সঙ্গে, আমকাঁঠালের বাগান দিয়ে পুঁটুরানিকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যেতে যেতে আমতলার অন্ধকারে মিশে গেল। তেঁতুলগাছের ভোঁদড়গুলো নাচতে নাচতে পাতার সঙ্গে মিলিয়ে গেল— দেশটা যেন মাটির নিচে ডুবে গেল!

বানর দেখলে— কোথায় ষষ্ঠীঠাকরুন, কোথায় কে! বটতলায় দিঘির ধারে ছেলে কোলে একলা দাঁড়িয়ে আছে! তখন বানর লোকজন ডেকে সেই সোনার চাঁদ ছেলেটিকে পালকি চড়িয়ে, আলো জ্বালিয়ে বাদ্যি বাজিয়ে সন্ধ্যাবেলা দিগনগর ছেড়ে গেল।

এদিকে পাটলি দেশে বেয়াইবাড়ি বসে বসে রাজা ভাবছেন— বানর এখনো এল না? আমার সঙ্গে ছল করলে? রাজ্যে গিয়ে মাথা কাটব। বিয়ের কনেটি ভাবছে— না জানি বর দেখতে কেমন? কনের মা-বাপ ভাবছে— আহা, বুকের বাছা পর হয়ে কার ঘরে চলে যাবে! রাজবাড়ির চাকর-দাসীরা ভাবছে— কাজ কখন সারা হবে, ছাদে উঠে বর দেখব। এমন সময় গুরু গুরু ঢোল বাজিয়ে, পোঁ-পোঁ বাঁশি বাজিয়ে, টকবক ঘোড়া হাঁকিয়ে, ঝকমক আলো জ্বালিয়ে, বানর বর নিয়ে এল। রাজা ছেলেকে হাত ধরে সভায় বসালেন, কনের বাপ বিয়ের সভায় মেয়ের হাত জামাইয়ের হাতে সঁপে

দিলেন, পাড়াপড়শি বরকে বরণ করলে, দাস-দাসী শাঁখ বাজালে, হুলু দিলে— বর-কনের বিয়ে হল।

রাজা ছেলের বিয়ে দিয়ে তার পরদিন বউ নিয়ে, ছেলে নিয়ে বাঁশি বাজিয়ে, ঘোড়া হাঁকিয়ে বানরের সঙ্গে দেশে ফিরলেন। পাটলি দেশের রাজার বাড়ি একরাত্তিরে শূন্য হয়ে গেল, মা-বাপের কোলের মেয়ে পরের ঘরে চলে গেল।

এদিকে রাজার দেশে বড়রানি দু-দিন দু-রাত কেঁদে, ভেবে ভেবে, ভোরবেলা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন— ষষ্ঠীঠাকরুন বলছেন, রানি, ওঠ। চেয়ে দেখ তোর কোলের বাছা ঘরে এল। রানি ঘুম ভেঙে উঠে বসলেন, দুয়ারে শুনলেন দাসীরা ডাকছে— ওঠ গো রানি ওঠ, পাটের শাড়ি পর, বউ-বেটা বরণ করতো!

রানি পাটের শাড়ি পরে বাইরে এলেন। এসে দেখলেন সত্যিই রাজা বউ-বেটা এনেছেন! হাসিমুখে বর-কনেকে কোলে নিলেন, ষষ্ঠীর বরে দুঃখের দিনের ক্ষীরের ছেলের কথা মনে রইল না, ভাবলেন ছেলের জন্য ভেবে ভেবে ক্ষীরের ছেলে স্বপ্ন দেখেছি।

রাজা এসে ছেলেকে রাজ্য যৌতুক দিলেন, সেই রাজ্যে বানরকে মন্ত্রী করে দিলেন, আর ছেলের কউকে মায়ারাজ্যের সেই আট হাজার মানিকের আটগাছি চুড়ি, দশ শো ভরি সোনার সেই দশগাছা মল পরিয়ে দিলেন। কন্যের হাতে মানিকের চুড়ি যেন রক্ত ফুটে পড়ল, পায়ে মল রিনিঝিনে বাজতে লাগল, ঝিকিমিকি জ্বলতে লাগল।

হিংসেয় ছোটরানি বুক ফেটে মরে গেল।

# পাতাল-কন্যা মণিমালা

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

এক রাজপুত্র আর এক মন্ত্রীপুত্র— দুই বন্ধুতে দেশভ্রমণে গিয়াছেন। যাইতে, যাইতে, এক পাহাড়ের কাছে গিয়া...সন্ধ্যা হইল!

মন্ত্রীপুত্র বলিলেন,— 'বন্ধু, পাহাড়-মুল্লুকে বড় বিপদ-আপদ; আইস, ওই গাছের ডালে উঠিয়া কোনো রকমে রাতটা কাটাইয়া দিই।'

রাজপুত্র বলিলেন,— 'সেই ভালো।'

দুইজনে ঘোড়া বাঁধিয়া রাখিয়া, এক সরোবরের পাড়ে খুব উঁচুগাছের আগডালে উঠিয়া শুইয়া রহিলেন।

অনেক রাত্রে রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র কী-জানি কিসের এক ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়া জাগিয়া দেখেন,— বনময় আলো!— সেই আলোতে ওরে বাপরে বাপ! রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্রের গা-অঙ্গ ডোল হইল, গায়ে পায়ে কাঁটা দিল,— দেখেন,— আকাশ পাতালে গলা ঠেকাইয়া এক কাল অজগর তাঁহাদের ঘোড়া দুইটাকে আস্ত-আস্ত গিলিয়া খাইতেছে! অজগরের মুখে ঘোড়া ছটফট করিতেছে!

দেখিতে দেখিতে ঘোড়া দুইটাকে গিলিয়া, যতদূর আলোকে দেখা যায়, অজগর বনের পোকামাকড় খাইতে খাইতে ততদূর বেড়াইতে লাগিল।

রাজপুত্র থরথর কাঁপেন! মন্ত্রীপুত্র চুপিচুপি বলিলেন,— 'বন্ধু। ডরাইও না, ওই যে আলো, ওটা সাত রাজার ধন ফণীর মণি,— মণিটি নিতে হইবে।'

রাজপুত্র বলিলেন,— 'সর্বনাশ! কেমন করিয়া নিবে?'

'ভয় নাই, দেখ, আমি মণি আনিব।'

বলিয়া, মন্ত্রীপুত্র, আস্তে আস্তে নামিয়া আসিয়াই এক খাবলা কাদা আনিয়া মণির উপর ফেলিয়া দিলেন। দিয়াই আপনার তরোয়ালখানি কাদার উপর উল্টাইয়া রাখিয়া, সরসর করিয়া গাছে উঠিয়া গেলেন! সব অন্ধকার;— দুইজনে চুপ!

অজগর, তার মণি!— সেই মণির আলো নিভিয়াছে; অজগর, হোঁস হোঁস শোঁস শোঁস শব্দে ছুটিয়া আসিল; দেখে, মণি নাই! অজগর তরোয়ালের উপর ফটাফট ছোবল মারিতে লাগিল।

কাদার তলে মণি নিখোঁজ— তলোয়ারের ধারে অজগরের ফণায় রক্তের বান। চোখে আগুনের হলক, মুখে বিষের ঝলক, অজগর পাগল হইয়া গেল।

কাল অজগর পাগল হইয়াছে,— সারা বনের গাছ মুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গে, লেজের বাড়িতে সরোবরের জল শতখান হইয়া যায়। অবশেষে রাগে, দুঃখে, অজগর, নিজের শরীর নিজে কামড়াইয়া তলোয়ারে মাথা খুঁড়িয়া মরিয়া গেল।

থরথর করিয়া দুই বন্ধুর রাত পোহাইল। পরদিন রোদ উঠিলে, দুইজনে বেশ করিয়া দেখিলেন, যে, না— অজগর সত্যিই মরিয়াছে। তখন নামিয়া কাদামাখা মণি কুড়াইয়া দুই বন্ধু সরোবরে নামিলেন।

## ২

নামিতে, নামিতে, দুই বন্ধু যতদূর যান,— জল কেবল দুই ভাগ হইয়া শুকাইয়া যায়! শেষে, মণির আলোতে দেখেন, পাতালপুরী পর্যন্ত এক পথ! দুইজনে চলিতে লাগিলেন।

খানিক দূর যাইতেই এক পরম সুন্দর অট্টালিকা। চারিদিকে ফুলবাগান,— ফুলে ফুলে ছড়াছড়ি, লতায়-লতায়, পাতায়-পাতায় জড়াজড়ি। দুই বন্ধু অট্টালিকার মধ্যে গেলেন।

অট্টালিকার মধ্যে সোঁ সোঁ রোঁ রোঁ শব্দ। রাজপুত্র ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। মন্ত্রীপুত্র বলিলেন— 'বন্ধু, ডরাইও না, মণি কাছে থাকিতে ভয় নাই।'

লকলকে চকচকে কোটি রঙের কোটি সাপ ডিঙ্গাইয়া, সাপের উপর দিয়া হাঁটিয়া দুই জনে এক ঘরে গেলেন! সেখানে সাপের দেওয়াল, সাপের থাম, সাপের মেজে, সাপের কড়ী, সাপের মণির দেওয়ালগিরি,— লক্ষ সাপের শয্যায় মণিমালা রাজকন্যা নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছেন।

রাজপুত্র বলিলেন,— 'বন্ধু, এ কী!'

মন্ত্রীপুত্র বলিলেন,— 'বন্ধু, দেখ, পাতালপুরীর পাতালকন্যা।'

আশ্চর্য হইয়া,— রাজপুত্র দেখিতে লাগিলেন।

ধীরে ধীরে মন্ত্রীপুত্র মণিটি নিয়া মণিমালার কপালে ছোঁয়াইতেই মণিমালা জাগিয়া উঠিয়া বসিলেন। রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্রকে দেখিয়া ত্রস্তে-ব্যস্তে মণিমালা বলিলেন,— 'আপনারা কে? এ যে কাল-অজগরের পুরী, আপনারা কেমন করিয়া এখানে আসিলেন!'

মন্ত্রীপুত্র কহিলেন,— 'রাজকন্যা, ভয় নাই; কাল অজগরকে আমরা মারিয়া ফেলিয়াছি। এই রাজপুত্র তোমার বর।'

রাজপুত্র মণিমালা দুইজনে, মাথা নিচু করিলেন।

হাসিয়া মন্ত্রীপুত্র মণিমালার গলার মালা রাজপুত্রের গলায় দিলেন, রাজপুত্রের গলার মালা মণিমালার গলায় দিলেন।

চারিদিকে লক্ষ সাপের ফণা হেলিয়া দুলিয়া উঠিল।

## ৩

সাপের পুরীতে পরম সুখে দিন যায়। কতক দিন পর, মন্ত্রীপুত্র বলিলেন,— 'বন্ধু, আমরা তো এখানে সুখেই আছি, দেশে কী হইল কে জানে! আমি যাই, পঞ্চকটক দোলা-বাদ্য সকলে নিয়া আসিয়া তোমাদিগকে বরণ করিয়া দেশে লইয়া যাইব।'

রাজপুত্র বলিলেন,— 'আচ্ছা।'

আবার সরোবরের পথে মণি দেখা দিল, মন্ত্রীপুত্র দেশে গেলেন। বন্ধুকে বিদায় দিয়া, মণি লইয়া রাজপুত্র ফিরিয়া আসিলেন।

দুইজনে আছেন। রাজপুত্র পৃথিবীর কত কথা মণিমালাকে বলেন, মণিমালা পাতালের কত কথা রাজপুত্রের কাছে বলেন। বলিতে বলিতে, একদিন মণিমালা বলিলেন,— 'জন্মে কখনো পৃথিবী দেখিলাম না, দেখিতে বড় সাধ যায়।'

রাজপুত্র কিছু বলিলেন না।

দুপুরে রাজপুত্র শুইয়া আছেন। রাজপুত্রকে ঘুমে দেখিয়া মণিমালা ক্ষার খৈল গামছা নিয়া মণিটি হাতে সরোবরের পথে পৃথিবীতে উঠিলেন।— 'আহা! কী সুন্দর!' পৃথিবী দেখিয়া মণিমালা অবাক। মণিমালা বলিলেন,— 'মণি, মণি! উজলে ওঠ, এই সরোবরের জলে আমি নাইব।'

অমনি মণির আলো উজলে উঠিল, সরোবরের মাঝখানে রাজহাঁসের থাক, শ্বেতপাথরের ধাপ ধবধবে সুন্দর ঘাটলা হইল। মণিমালা ধাপের উপর মণি রাখিয়া, ক্ষার খৈল দিয়া গা-পা কচলাইতে লাগিলেন।

সেই সময় সেই দেশের রাজপুত্র সেই বনে শিকার করিতে আসিয়াছেন। তিনি সব দেখিলেন। দেখিয়াই রাজপুত্র ছুটিয়া আসিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।

চমকিয়া মণিমালা দেখেন,— মানুষ! মণি লইয়া মণিমালা ডুব দিলেন। চক্ষের পলকে সব কোথায় গেল!— রাজপুত্র 'হায় হায়' করিতে করিতে ফিরিয়া গেলেন।

কাঠকুড়ানী পেঁচোর মা এক বুড়ি এই সব দেখিল। দেখিয়া বুড়ি চুপটি করিয়া রহিল।

৪

শিকারে গিয়া রাজপুত্র পাগল হইয়া আসিয়াছেন; কত ওষুধ বিষুধ, কিছুতেই রোগ সারে না; রাজা-রানি অধীর, রাজ্যের লোক অস্থির। অবশেষে রাজা ঢেঁটরা দিলেন,— 'রাজপুত্রকে যে ভালো করিতে পারিবে, অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা তাকে দিব।' কে ঢেঁটরা ছুঁইবে? কেহই ছুঁইল না। শেষে পেঁচোর মা বুড়ি এই কথা শুনিল। শুনিয়া বুড়ি উঠে কি পড়ে আছাড়ি-বিছাড়ি সাত তাড়াতাড়ি আসিয়া ঢেঁটরা ধরিল।

রাজার কাছে গিয়া বুড়ি বলিল,— 'তা রাজামশাই, আমি তো ওষুধ জানি,— তা আমি বুড়ো হাবড়া মেয়েমানুষ, তা আমার পেঁচোর সঙ্গে যদি রাজকন্যার বিয়ে দাও, তো রাজপুত্রকে ওষুধ দিই'

রাজা তাহাই স্বীকার করিলেন।

তখন পেঁচোর মা বুড়ি একরাশ তুলা, একটা চরকা নিয়া, পবনের নায়ে উঠিয়া বলিল,—

'ঘ্যাঁঘর চরকা ঘ্যাঁঘর,
রাজপুত্র পাগল!
হটর হটর পবনের না',
মণিমালার দেশ যা।'

পবনের না' মণিমালার দেশে গেল। বুড়ি সরোবরের কিনারে বসিয়া ঘ্যাঁঘর ঘ্যাঁঘর করিয়া চরকায় সূতা কাটিতে লাগিল।

আবার দুপুরে রাজপুত্র শুইয়াছেন; মণিমালা মণি নিয়া উঠিয়া আসিলেন,— 'ও বুড়ি, বুড়ি তুই কোথা থেকে এলি? আমাকে একখানা শাড়ি বুনিয়া দে।'

বুড়ি শাড়ি বুনিয়া দিয়া কড়ি চাহিল! মণিমালা বলিলেন,— 'বুড়ি, কড়ি তো নাই, এই এক মণি আছে!' বুড়ি বলিল,— 'তা, তা— তাই দাও।' মণিমালা মণি দিতে গেলেন, বুড়ি খপ করিয়া মণিমালাকে পবনের নৌকায় উঠাইয়া বলিল,—

'ঘ্যাঁঘর চরকা ঘ্যাঁঘর,
রাজপুত্র পাগল!
হটর হটর পবনের না',
রাজপুত্রের কাছে যা।'

আর কী? বুড়ি মণিমালাকে রাজপুরীতে দিয়া, মণিটি লুকাইয়া নিয়া বাড়িতে গেল।

রাজপুত্র ভালো হইলেন! মণিমালার সঙ্গে তাঁহার বিয়ে! পেঁচোর সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ হইবে কি না? সাত বচ্ছর নিখোঁজ পেঁচোর জন্যে বুড়ি দেশে দেশে লোক পাঠাইল।

মণিমালা বলিলেন,— 'আমার এক বৎসর ব্রত, এক বৎসর পরে যা হয় হইবে।'

সকলে বলিলেন,— 'আচ্ছা।'

মণি গেল, মণিমালা গেল, সাপের নিশ্বাস গরল, সাপের পরশ হিম, আজ রাজপুত্র ঘুমে ঢুলু ঢুলু। ঢুলিয়া রাজপুত্র সাপের শয্যায় ঘুরিয়া পড়িলেন।

শিয়রের সাপ ফণা তুলিয়া গর্জিয়া উঠিল, আশের সাপ পাশের সাপ, গা-মোড়া দিয়া উঠিয়া রাজপুত্রকে আষ্টে-পিষ্ঠে জড়াইয়া ধরিল। নাগপাশের বাঁধনে রাজপুত্র সাপের শয্যায় বিষের ঘোরে অচেতন হইয়া রহিলেন।

## ৫

দোলা চৌদোলা পঞ্চকটক নিয়া সরোবরের পাড়ে আসিয়া মন্ত্রীপুত্র ডাকেন— 'বন্ধু! বন্ধু! পথ দেখাও।'

না, সাড়াশব্দ কিছুই নাই! দিনের পর দিন গেল, রাত্রির পর রাত্রি গেল, বন্ধু আর সাড়া দিল না। তখন মন্ত্রীপুত্র ভাবিত হইয়া, পঞ্চকটক বনে রাখিয়া, বাহির হইলেন।

খানিক দূর গেলে, পথের লোকেরা বলিল,— 'কে গো তুমি কার বাছা, পেঁচোকে দেখিয়াছ? পেঁচো রাজার জামাই হইবে, পেঁচোর মা বুড়ি পেঁচোর খোঁজে পথে পথে ঘুরে।'

মন্ত্রীপুত্র বলিলেন,— 'হাঁ, হাঁ, আমি পেঁচোকে দেখিয়াছি; তা সে রাজত্ব রাজকন্যা পাইল কেন?'

লোকেরা সকল কথা বলিল।

মন্ত্রীপুত্র বলিল, 'বেশ বেশ! তা, পেঁচোর রূপটি,— রূপটি যেন কেমন?' লোকেরা পেঁচোর রূপের কথা বলিল।

শুনিয়া মন্ত্রীপুত্র চলিয়া আসিলেন।

পরদিন মন্ত্রীপুত্র করিলেন কী, পোশাক টোশাক ছাড়িয়া, গালে মুখে কালি, গায়ে পায়ে ছেঁড়া কাণি, বুড়ির বাড়িতে গিয়া উপস্থিত। খক খক কাশি, খিলখিল হাসি, দুই হাতে দুই গাছের ডাল— পেঁচোর নাচে উঠান কাঁপে।

আথিবিথি বুড়ি ছুটিয়া আসিল,— 'এই তো আমার বাছা!— আহা আহা বুকের মাণিক, কোথায় ছিলি ঘরে এলি?— আয় আয়, তোর জন্যে—

রাজ-রাজিত্বি দুধের বাটি,
রাজকন্যা পরিপাটি

সোনার দানা মোহর থান—
সাতরাজার ধন মণি খান—

— তোরি জন্যে রেখেছি!' আহ্লাদে আটখানা বুড়ি গুড়ুসুড়ু মণিটি বাহির করিয়া চুপিচুপি পেঁচোর হাতে দিল।

মণি পাইয়া পেঁচো তো তিন লাফে, ঘর!— 'মা, মা আমি তো ভালো হইয়াছি!— এই দেখ কেমন আমার নূপ,— নূপের গাঙ্গে নূপ ভেসে যায়।'

বুড়ি বলিল,— 'আহা আহা বাছা আমার! এত রূপ নিয়ে কোথায় ছিলি,— রাজকন্যা তোর জন্য কাঁদিয়া পাগল!'

পরদিন বুড়ি আউল চুলের ঝুঁটি বাঁধিয়া নড়ি ঠকঠক, রাজার কাছে গেল।

— 'তা, তা, রাজামশাই, রাজামশাই, রাজকন্যা বাহির কর— পেঁচো আমার আসিয়াছে। আহা আহা, পেঁচোর আমার যে রূপ,— রূপ নয় তো নূপ,— নূপের গাঙ্গে নূপ ভেসে যায়।'

রাজা কী করেন, পেঁচোর সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দিলেন।

## ৬

বাসরঘরে মন্ত্রীপুত্র পেঁচো রাজকন্যাকে সব কথা বলিলেন। শুনিয়া রাজকন্যা নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন; বলিলেন,— 'আমার ভাই মণিমালাকে আটক করিয়া রাখিয়াছেন।'

তখন মন্ত্রীপুত্র চুপিচুপি বলিলেন,— 'আমি যা-যা বলি মণিমালাকে চুপিচুপি এইসব কথা বলিও, আর এই জিনিসটি মণিমালার হাতে দিও।' বলিয়া মন্ত্রীপুত্র ফণীর মণিটি রাজকন্যার কাছে দিলেন।

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন গেল। চার দিনের দিন, রাত পোহাইলে, মণিমালা বলিলেন,— 'রাজপুত্র আমার ব্রত শেষ হইয়াছে, আমি আজ বরণসাজে সাজিয়া নদীর জলে স্নান করিব। আমার সঙ্গে বাদ্য-ভাণ্ড দিও না, জন-জৌলুষ দিও না; কেবল এক পেঁচো আর রাজকন্যা যাইবেন।'

অমনি রাজপুরী হইতে নদীর ঘাটে চাঁদোয়া পড়িল। মণিমালা, পেঁচোকে আর রাজকন্যাকে নিয়া বরণ-সাজে স্নান করিতে গেলেন। স্নান না স্নান!— জলে নামিয়াই মণিমালা বলিলেন,— '

'মণি আমার, আমায় ভুলে কোথায় ছিলি?'

'বুড়ির থলে।'

'কোথায় এসে আবার মণি আমায় পেলি?'

'পেঁচোর গলে।'

মণিমালা বলিলেন,—

'আজ তবে চল মণি অগাধ জলে!'

দেখিতে না দেখিতে নদীর জল দু-ফাঁক হইল, পেঁচো আর রাজকন্যাকে নিয়া মণিমালা তাহার মধ্যে অদেখা হইয়া গেলেন।

রাজপুত্র করেন— 'হায়। হায়!'

মাথা খুঁড়িয়া বুড়ি মরিল,

রাজ্য ভরিয়া কান্না উঠিল।

## ৭

শিয়রের সাপ গুড়িসুড়ি, গায়ের সাপ ছাড়াছাড়ি,— রাজপুত্র চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন— তখন, মণির আলো মণির বাতি, ঢাকঢোলে হাজার কাটী, রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র, মণিমালা আর রাজকন্যাকে লইয়া আপন দেশে চলিয়া গেলেন!

পাতালপুরীর সাপের রাজ্যের সকল সাপ বাতাস হইয়া উড়িয়া গেল।

# শীত-বসন্ত

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

১

এক রাজার দুই রানি— সুয়োরানি আর দুয়োরানি। সুয়োরানি যে, নুনটুকু উন হইতেই নখের আগায় আঁচড় কাটিয়া, ঘর-কন্নায় ভাগ বাঁটিয়া সতিনকে একপাশে করিয়া দেয়। দুঃখে দুয়োরানির দিন কাটে।

সুয়োরানির ছেলে-পিলে হয় না। দুয়োরানির দুই ছেলে,— শীত আর বসন্ত। আহা, ছেলে নিয়া দুয়োরানির যে যন্ত্রণা!— রাজার রাজপুত্র, সৎ-মায়ের গঞ্জনা খাইতে খাইতে দিন যায়।

একদিন নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়া সুয়োরানি দুয়োরানিকে ডাকিয়া বলিল— 'আয় তো, তোর মাথায় ক্ষার খৈল দিয়া দি।' ক্ষার খৈল দিতে দিতে সুয়োরানি চুপ করিয়া দুয়োরানির মাথায় এক ওষুধের বড়ি টিপিয়া দিল। দুঃখিনী দুয়োরানি টিয়া হইয়া 'টি, টি' করিতে করিতে উড়িয়া গেল।

বাড়ি আসিয়া সুয়োরানি বলিল,— 'দুয়োরানি তো জলে ডুবিয়া মরিয়াছে!'

রাজা তাহাই বিশ্বাস করিলেন।

রাজপুরীর লক্ষ্মী গেল, রাজপুরী আঁধার হইল; মা-হারা শীত-বসন্তের দুঃখের সীমা রহিল না।

টিয়া হইয়া দুঃখিনী দুয়োরানি উড়িতে উড়িতে আর এক রাজার রাজ্যে গিয়া পড়িলেন। রাজা দেখেন, সোনার টিয়া। রাজার এক টুকটুকে মেয়ে, সেই মেয়ে বলিল,— 'বাবা, আমি সোনার টিয়া নিব।'

টিয়া-দুয়োরানি রাজকন্যার কাছে সোনার পিঞ্জরে রহিলেন।

## ২

দিন যায়, বছর যায়, সুয়োরানির তিন ছেলে হইল। ও মা! এক-এক ছেলে যে, বাঁশের পাতা-পাটকাঠি, ফুঁ দিলে উড়ে, ছুঁইতে গেলে মরে। সুয়োরানি কাঁদিয়া কাটিয়া রাজ্য ভাসাইল।

পাটকাঠি তিন ছেলে নিয়ে সুয়োরানি গুমরে গুমরে আগুনে পড়িয়া ঘর করে। মন-ভরা জ্বালা, পেট-ভরা হিংসা,— আপনার ছেলেদের থালে পাঁচ পরমা অষ্টরন্ধন, ঘিয়ে চপচপ পঞ্চব্যঞ্জন সাজাইয়া দেন; শীত-বসন্তের পাতে আলুন আ-তেল কড়কড়া ভাত সড়সড়া চাল শাকের উপর ছাইয়ের তাল ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যান।

সতিন তো 'উরী পুরী দক্ষিণ-দুর'— সতিনের ছেলে দুইটা যে, নাদুস-নুদুস— আর তাঁহার তিন ছেলে পাটকাঠি! হিংসায় রানির মুখে অন্ন রুচে না, নিশিতে নিদ্রা হয় না।

রানি তে-পথের ধূলা এলাইয়া, তিন কোণের কুটা জ্বালাইয়া, বাসি উনুনের ছাই দিয়া, ভাঙা কুলায় করিয়া সতিনের ছেলের নামে ভাসাইয়া দিল।

কিছুতেই কিছু হইল না।

শেষে, একদিন শীত-বসন্ত পাঠশালায় গিয়াছে; কিছুই জানে না, শোনে না, বাড়িতে আসিতেই রণমূর্তি সৎ-মা তাহাদিগে গালমন্দ দিয়া খেদাইয়া দিল!

তাহার পর রানি, বাঁশপাতা ছেলে তিনটাকে আছাড় মারিয়া থুইয়া, উথাল-পাতাল করিয়া এ জিনিস ভাঙ্গে ও জিনিস চূরে; আপন মাথার চুল ছিঁড়ে, গায়ের আভরণ ছুড়িয়া মারে।

দাসী, বাঁদি, গিয়া রাজাকে খবর দিল!

'সুয়োরানির ডরে
থর থর থর করে'—

রাজা আসিয়া বলিলেন,— 'এ কী!'

রানি বলিল,— 'কী! সতিনের ছেলে, সেই আমাকে গালমন্দ দিল। শীত-বসন্তের রক্ত নহিলে আমি নাইব না!'

অমনি রাজা জল্লাদকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন,— 'শীত-বসন্তকে কাটিয়া রানিকে রক্ত আনিয়া দাও।'

শীত-বসন্তের চোখের জল কে দেখে! জল্লাদ শীত-বসন্তকে বাঁধিয়া নিয়া গেল।

## ৩

এক বনের মধ্যে আনিয়া, জল্লাদ, শীত-বসন্তের রাজ-পোশাক খুলিয়া, বাকল পরাইয়া দিল।

শীত বলিলেন,— 'ভাই, কপালে এই ছিল!'

বসন্ত বলিলেন,— 'দাদা, আমরা কোথায় যাব?'

কাঁদিতে কাঁদিতে শীত বলিলেন,— 'ভাই, চল, এতদিন পরে আমরা মা-র কাছে যাব।'

খড়্গ নামাইয়া রাখিয়া দুই রাজপুত্রের বাঁধন খুলিয়া দিয়া, ছলছল চোখে জল্লাদ বলিল,— 'রাজপুত্র! রাজার আজ্ঞা, কী করিব— কোলে-কাঁখে করিয়া মানুষ করিয়াছি, সেই সোনার অঙ্গে আজ কি না খড়্গ ছোঁয়াইতে হইবে!— আমি তা পারিব না রাজপুত্র।— আমার কপালে যা থাকে থাকুক, এই বাকল চাদর পরিয়া বনের পথে চলিয়া যাও, কেহ আর রাজপুত্র বলিয়া চিনিতে পারিবে না।'

বলিয়া, শীত-বসন্তকে পথ দেখাইয়া দিয়া, দুইটা শিয়াল-কুকুর কাটিয়া, জল্লাদ, রক্ত নিয়া রানিকে দিল।

রানি সেই রক্ত দিয়া স্নান করিলেন; খিল খিল করিয়া হাসিয়া আপনার তিন ছেলে কোলে, পাঁচ পাত সাজাইয়া, খাইতে বসিলেন।

## ৪

শীত-বসন্ত দুই ভাই চলেন, চলেন, বন আর ফুরায় না। শেষে, দুই ভাইয়ে এক গাছের তলায় বসিলেন।

বসন্ত বলিলেন— 'দাদা, বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে, জল কোথায় পাই?'

শীত বলিলেন,— 'ভাই, এত পথ আসিলাম, জল তো কোথাও দেখিলাম না! আচ্ছা, তুমি বস, আমি জল দেখিয়া আসি।'

বসন্ত বসিয়া রহিল, শীত জল আনিতে গেলেন।

যাইতে, যাইতে, অনেক দূরে গিয়া, শীত বনের মধ্যে এক সরোবর দেখিতে পাইলেন। জলের তৃষ্ণায় বসন্ত না জানি কেমন করিতেছে,— কিন্তু কিসে করিয়া জল নিবেন? তখন গায়ের যে চাদর, সেই চাদর খুলিয়া, শীত সরোবরে নামিলেন।

সেই দেশের যে রাজা, মারা গিয়েছেন। রাজার ছেলে নাই, পুত্র নাই, রাজসিংহাসন খালি পড়িয়া আছে। রাজ্যের লোকজনে শ্বেত রাজহাতির পিঠে পাটসিংহাসন উঠাইয়া দিয়া হাতি ছাড়িয়া দিল। হাতি যাহার কপালে রাজটিকা দেখিবে, তাহাকেই রাজসিংহাসনে উঠাইয়া দিয়া আসিবে, সে-ই রাজ্যের রাজা হইবে।

রাজসিংহাসন পিঠে শ্বেত রাজহাতি, পৃথিবী ঘুরিয়া কাহারও কপালে রাজটিকা দেখিল না। শেষে ছুটিতে ছুটিতে, যে বনে শীত-বসন্ত, সেই বনে আসিয়া দেখে, এক রাজপুত্র গায়ের চাদর ভিজাইয়া সরোবরে জল নিতেছে।— রাজপুত্রের কপালে রাজটিকা। দেখিয়া, শ্বেত রাজহাতি অমনি শুঁড় বাড়াইয়া শীতকে ধরিয়া সিংহাসনে তুলিয়া নিল।

'ভাই বসন্ত, ভাই বসন্ত' করিয়া শীত কত কাঁদিলেন। হাতি কি তাহা মানে? বনজঙ্গল ভাঙ্গিয়া, পাট-হাতি শীতকে পিঠে করিয়া ছুটিয়া গেল।

৫

জল আনিতে গেল, দাদা আর ফিরে না। বসন্ত উঠিয়া সকল বন খুঁজিয়া, 'দাদা, দাদা' বলিয়া ডাকিয়া খুন হইল। দাদাকে যে হাতিতে নিয়াছে, বসন্ত তো তাহা জানে না; বসন্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। শেষে, দিন গেল, বিকাল গেল, সন্ধ্যা গেল, রাত্রি হইল; তৃষ্ণায় ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, দাদাকে হারাইয়া কাঁদিয়া বসন্ত এক গাছের তলায় ধুলামাটিতে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

দুঃখিনী মায়ের বুকের মাণিক ছাইপাঁশে গড়াগড়ি গেল!

খুব ভোরে, এক মুনি, জপতপ করিবেন, জল আনিতে সরোবরে যাইতে, দেখেন কোন্ এক পরম সুন্দর রাজপুত্র গাছের তলায় ধুলামাটিতে পড়িয়া আছে। দেখিয়া, মুনি বসন্তকে বুকে তুলিয়া নিয়া গেলেন।

৬

শ্বেত রাজহাতির পিঠে শীত তো সেই নাই-রাজার রাজ্যে গেলেন! যাইতেই, রাজ্যের যত লোক আসিয়া মাটিতে মাথা ছোঁয়াইল, মন্ত্রী, অমাত্য, সিপাই-সান্ত্রিরা সকলে আসিয়া মাথা নোয়াইল, নোয়াইয়া সকলে রাজসিংহাসনে তুলিয়া নিয়া শীতকে রাজা করিল।

প্রাণের ভাই বসন্ত, সেই বসন্ত-বা কোথায়, শীত-বা কোথায়! দুঃখিনী মায়ের দুই মাণিক বোঁটা ছিঁড়িয়া দুইখানে পড়িল।

রাজা হইয়া শীত, ধন-রত্ন, মণি-মাণিক্য, হাতি-ঘোড়া, সিপাই-লস্কর লইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। আজ এ রাজাকে হারাইয়া দিয়া তাহার রাজ্য নেন, কাল ও রাজাকে হারাইয়া দিয়া তাহার রাজ্য আনেন, আজ মৃগয়া করেন, কাল দিগ্বিজয়ে যান,— এই রকমে দিন যায়!

মুনির কাছে আসিয়া বসন্ত, গাছের ফল খায়, সরোবরের জলে নায়, দায়, থাকে। মুনি চারিপাশে আগুন করিয়া বসিয়া থাকেন, কতদিন কাঠকুটা ফুরাইয়া যায়,— বসন্তের পরনে বাকল, হাতে নড়ি, বনে বনে ঘুরিয়া কাঠকুটা কুড়াইয়া, মুনির জন্য বহিয়া আনে।

তাহার পর বসন্ত বনের ফুল তুলিয়া মুনির কুটির সাজায় আর সারাদিন ভরিয়া ফুলের মধু খায়।

তাহার পর, সন্ধ্যা হইতে-না-হইতে, বনের পাখি সব একখানে হয়, আপন আপন বাসায় যায়, বসন্ত মুনির পাশে বসিয়া কত শাস্ত্রের কথা, কত মন্ত্রের কথা এইসব শোনে। এইভাবে দিন যায়।

রাজসিংহাসনে শীত আপন রাজ্য লইয়া, বনে বসন্ত আপন বন লইয়া;— দিনে দিনে পলে পলে কাহারও কথা কাহারও মনে থাকিল না।

৭

তিন রাত যাইতে-না-যাইতে সুয়োরানির পাপে রাজার সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল;— দিন যাইতে না-যাইতেই রাজার রাজ্য গেল, রাজপাট গেল। সকল হারাইয়া, খোয়াইয়া, রাজা আর সুয়োরানির মুখ দেখিলেন না; রাজা বনবাসে গেলেন।

সুয়োরানির যে, সাজা! ছেলে তিনটা সঙ্গে, এক নেকড়া পরনে, এক নেকড়া গায়ে, এ দুয়ারে যায়— 'দূর দূর!' ও দুয়ারে যায়— 'ছেই, ছেই!!' তিন ছেলে নিয়া সুয়োরানি চক্ষের জলে ভাসিয়া পথে পথে ঘুরিতে লাগিলেন।

ঘুরিতে ঘুরিতে সুয়োরানি সমুদ্রের কিনারে গেলেন।— আর সাত সমুদ্রের ঢেউ আসিয়া চক্ষের পলকে সুয়োরানি তিন ছেলেকে ভাসাইয়া নিয়া গেল। সুয়োরানি কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইল; বুকে চাপড়, কপালে চাপড় দিয়া, শোকে দুঃখে পাগল হইয়া মাথায় পাষাণ মারিয়া, সুয়োরানি সকল জ্বালা এড়াইল। সুয়োরানির জন্য পিঁপড়াটিও কাঁদিল না, কুটাটুকুও নড়িল না,— সাত সমুদ্রের জল সাতদিনের পথে সরিয়া গেল। কোথায়-বা সুয়োরানি, কোথায়-বা তিন ছেলে— কোথাও কিছু রহিল না।

৮

সেই যে সোনার টিয়া— সেই যে রাজার মেয়ে? সেই রাজকন্যার যে স্বয়ম্বর! কত ধন, কত দৌলত, কত কী লইয়া কত দেশের কত রাজপুত্র আসিয়াছে। সভা করিয়া সকলে বসিয়া আছেন, এখনো রাজকন্যার বর নাই।

রূপবতী রাজকন্যা আপন ঘরে সিঁথিপাটি কাটিয়া, আলতা-কাজল পরিয়া, সোনার টিয়াকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'সোনার টিয়া, বল তো আমার আর কী চাই?'

টিয়া বলল,—

'সাজতো ভালো কন্যা, যদি সোনার নূপুর পাই!'

রাজকন্যা কৌটা খুলিয়া সোনার নূপুর বাহির করিয়া পায়ে দিলেন। সোনার নূপুর রাজকন্যার পায়ে রুনু-ঝুনু করিয়া বাজিয়া উঠিল! রাজকন্যা বলিলেন,—

'সোনার টিয়া বল তো আমার আর কী চাই?'

টিয়া বলিল,—

'সাজতো ভালো কন্যা, যদি ময়ূরপেখম পাই।'

রাজকন্যা পেটরা আনিয়া ময়ূরপেখম শাড়ি খুলিয়া পরিলেন। শাড়ির রঙে ঘর উজল, শাড়ির শোভায় রাজকন্যার মন উতল। মুখখানা ভার করিয়া টিয়া বলিল,—

'রাজকন্যা, রাজকন্যা, কিসের গরব কর;—
শতেক নহর হিরার হার গলায় না পর!'

রাজকন্যা শতেক নহর হিরার হার গলায় দিলেন। শতেক নহরে শতেক হিরা ঝকঝক করিয়া উঠিল!

টিয়া বলিল,—

'শতেক নহর ছাই!
নাকে ফুল কানে দুল
সিঁথির মানিক চাই!'

রাজকন্যা নাকে মোতির ফুলের নোলক পরিলেন; সিঁথিতে মণি-মাণিক্যের সিঁথি পরিলেন।

তখন রাজকন্যার টিয়া বলিল,—

'রাজকন্যা রূপবতী নাম থুয়েছে মায়।
গজমোতি হত শোভা ষোল-কলায়।
না আনিল গজমোতি, কেমন এল বর?
রাজকন্যা রূপবতীর ছাইয়ের স্বয়ম্বর!'

শুনিয়া, রূপবতী রাজকন্যা গায়ের আভরণ, পায়ের নূপুর, ময়ূর পেখম, কানের দুল ছুড়িয়া ছিঁড়িয়া, মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। কিসের স্বয়ম্বর, কিসের কী!

রাজপুত্রদের সভায় খবর গেল, রাজকন্যা রূপবতী স্বয়ম্বর করিবেন না; রাজকন্যার পণ, যে রাজপুত্র গজমোতি আনিয়া দিতে পারিবেন, রাজকন্যা তাঁহার হইবেন— না পারিলে রাজকন্যার নফর হইয়া থাকিতে হইবে।

সকল রাজপুত্র গজমোতির সন্ধানে বাহির হইলেন।

কত রাজ্যের কত হাতি আসিল, কত হাতির মাথা কাটা গেল— যে-সে হাতিতে কী গজমোতি থাকে? গজমোতি পাওয়া গেল না।

রাজপুত্রেরা শুনিলেন,

সমুদ্রের কিনারে হাতি,
তাহার মাথায় গজমোতি।

সকল রাজপুত্রে মিলিয়া সমুদ্রের ধারে গেলেন।

সমুদ্রের ধারে যাইতে-না-যাইতেই একপাল হাতি আসিয়া অনেক রাজপুত্রকে মারিয়া ফেলিল, অনেক রাজপুত্রের হাত গেল, পা গেল। গজমোতি কি মানুষে আনিতে পারে? রাজপুত্রেরা পলাইয়া আসিলেন।

আসিয়া, রাজপুত্রেরা কী করেন— রূপবতী রাজকন্যার নফর হইয়া রহিলেন।

কথা শীতরাজার কানে গেল! শীত বলিলেন,— 'কী! রাজকন্যার এত তেজ, রাজপুত্রদিগকে নফর করিয়া রাখে। রাজকন্যার রাজ্য আটক কর!'

রাজকন্যা শীত রাজার হাতে আটক হইয়া রহিলেন।

## ৯

আজ যায় কাল যায়, বসন্ত মুনির বনে থাকেন। পৃথিবীর খবর বসন্তের কাছে যায় না, বসন্তের খবর পৃথিবী পায় না।

মুনির পাতার কুঁড়ে; পাতার কুঁড়েতে এক শুক আর এক শারী থাকে।

একদিন শুক কয়,—

'শারী, শারী! বড় শীত!'

শারী বলে,—

'গায়ের বসন টেনে দিস!'

শুক বলে,—

'বসন গেল ছিঁড়ে, শীত গেল দূর,
কোন্‌খানে, শারী, নদীর কূল?'

শারী উত্তর করিল,—

'দুধ-মুকুটে' ধবল পাহাড় ক্ষীর-সাগরের পাড়ে,
গজমোতির রাঙা আলো ঝরঝরিয়ে পড়ে।
আলোর তলে পদ্ম-পাতে খেলে দুধের জল,
হাজার হাজার ফুটে আছে সোনার-কমল ॥'

শুক কহিল,—

'সেই সোনার কমল, সেই গজমোতি
কে আনবে তুলে, কে পাবে রূপবতী!'

শুনিয়া বসন্ত বলিলেন,—

'শুক-শারী মেসো-মাসি
কী বলছিস বল,
আমি আনব গজমোতি
সোনার কমল।'

শুক-শারী বলিল,—

'আহা বাছা, পারিবি?'

বসন্ত বলিলেন,—

'পারিব না তো কী!'

শুক বলিল,—

'তবে মুনির কাছে গিয়া ত্রিশূলটা চা!'

শারী বলিল— 'শিমুল গাছে কাপড়-চোপড় আছে,

মুকুট আছে, তাই নিয়া যা।'

বসন্ত মুনির কাছে গেল। গিয়া বলিল,— 'বাবা, আমি গজমোতি আর সোনার কমল আনিব, ত্রিশূলটা দাও।'

মুনি ত্রিশূল দিলেন।

মুনির পায়ে প্রণাম করিয়া, ত্রিশূল হাতে বসন্ত শিমুলগাছের কাছে গেলেন। গিয়া দেখেন শিমুলগাছে কাপড়-চোপড়, শিমুলগাছে রাজমুকুট। বসন্ত বলিলেন, 'হে বৃক্ষ, যদি সত্যকারের বৃক্ষ হও, তো, তোমার কাপড়-চোপড় আর তোমার রাজমুকুট আমাকে দাও।'

বৃক্ষ বসন্তকে কাপড়-চোপড় আর রাজমুকুট দিল। বসন্ত বাকল ছাড়িয়া কাপড়-চোপড় পরিলেন; রাজমুকুট মাথায় দিলেন। দিয়া, বসন্ত, ক্ষীর-সাগরের উদ্দেশে চলিতে লাগিলেন।

যাইতে, যাইতে, যাইতে, বসন্ত কত পর্বত, কত বন, কত দেশ-বিদেশ ছাড়াইয়া বারো বচ্ছর তের দিনে 'দুধ-মুকুটে' ধবল পাহাড়ের কাছে গিয়া পৌঁছিলেন। ধবল পাহাড়ের মাথায় দুধের সর থকথক, ধবল পাহাড়ের গায়ে দুধের ঝরনা ঝরঝর; বসন্ত সেই পাহাড়ে উঠিলেন।

উঠিয়া দেখেন, ধবল পাহাড়ের নিচে ক্ষীরের-সাগর—

ক্ষীর-সাগরে ক্ষীরের ঢেউ ঢল ঢল করে—
লক্ষ হাজার পদ্মফুল ফুটে আছে থরে।
ঢেউ থইথই সোনার কমল, তারি মাঝে কী?—
দুধের বরণ হাতির মাথে— গজমোতি।

বসন্ত দেখিলেন, চারিদিকে পদ্মফুলের মধ্যে দুধবরণ হাতি দুধের জল ছিটাইয়া খেলা করিতেছে— সেই হাতির মাথায় গজমোতি— সোনার মতন, মণির মতন, হীরার মতন গজমোতির জ্বলজ্বলে আলো ঝরঝর করিয়া পড়িতেছে। গজমোতির আলোতে ক্ষীর-সাগরে হাজার চাঁদের মেলা, পদ্মের বনে পাতে পাতে সোনার কিরণ খেলা। দেখিয়া, বসন্ত অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তখন, বসন্ত কাপড়-চোপড় কষিয়া, হাতের ত্রিশূল আঁটিয়া ধবল পাহাড়ের উপর হইতে ঝাঁপ দিয়া গজমোতির উপরে পড়িলেন।

অমনি ক্ষীর-সাগর শুকাইয়া গেল, পদ্মের বন লুকাইয়া গেল; দুধ-বরণ হাতি এক সোনার পদ্ম হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

'কোন্ দেশের রাজপুত্র কোন্ দেশে ঘর?'

বসন্ত বলিলেন,—

'বনে বনে বাস, আমি মুনির কোঙর।'

পদ্ম বলিল,—

'মাথে রাখ গজমোতি, সোনার কমল বুকে,
রাজকন্যা রূপবতী ঘর করুক সুখে!'

বসন্ত সোনার পদ্ম তুলিয়া বুকে রাখিলেন, গজমোতি তুলিয়া মাথায় রাখিলেন। রাখিয়া, ক্ষীর-সাগরের বালুর উপর দিয়া বসন্ত দেশে চলিলেন।

অমনি ক্ষীর-সাগরের বালুর তলে কাহারা বলিয়া উঠিল,— 'ভাই, ভাই! আমাদিগে নিয়ে যাও।'

বসন্ত ত্রিশূল দিয়া বালু খুঁড়িয়া দেখেন, তিন যে সোনার মাছ! তিন সোনার মাছ লইয়া বসন্ত চলিতে লাগিলেন।

বসন্ত যেখান দিয়া যান, গজমোতির আলোতে দেশ উজল হইয়া উঠে।

লোকেরা বলে,— 'দেখ, দেখ, দেবতা যায়!'

বসন্ত চলিতে লাগিলেন।

## ১০

শীতরাজা মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন। সকল রাজ্যের বন খুঁজিয়া, একটা হরিণ যে, তাহাও পাওয়া গেল না। শীত সৈন্য-সামন্তের হাতে ঘোড়া দিয়া এক গাছতলায় আসিয়া বসিলেন।

গাছতলায় বসিতেই শীতের গায়ে কাঁটা দিল। শীত দেখিলেন, এই তো সেই গাছ! এই গাছের তলায় জল্লাদের কাছ হইতে বনবাসী দুই ভাই আসিয়া বসিয়াছিলেন, ভাই বসন্ত জল চাহিয়াছিল, শীত জল আনিতে গিয়াছিলেন। সব কথা শীতের মনে হইল,— রাজমুকুট ফেলিয়া দিয়া, খাপ-তরোয়াল ছুড়িয়া দিয়া, শীত, 'ভাই বসন্ত!' 'ভাই বসন্ত!' করিয়া ধুলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সৈন্য-সামন্তেরা দেখিয়া অবাক! তাহারা দোল-চৌদোল আনিয়া রাজাকে তুলিয়া রাজ্যে লইয়া গেল।

## ১১

গজমোতির আলোতে দেশ উজল করিতে করিতে বসন্ত রূপবতী রাজকন্যার দেশে আসিলেন।

রাজ্যের লোক ছুটিয়া আসিল,— 'দেখ, দেখ, কে আসিয়াছেন!'

বসন্ত বলিলেন,— 'আমি বসন্ত, গজমোতি আনিয়াছি।'

রাজ্যের লোক কাঁদিয়া বলিল,— 'এক দেশের শীতরাজা রাজকন্যাকে আটক করিয়া রাখিয়াছেন।'

শুনিয়া, বসন্ত শীতরাজার রাজ্যে গিয়ে, তিন সোনার মাছ রাজাকে পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন— 'রূপবতী রাজকন্যার রাজ্যের দুয়ার খুলিয়া দিতে আজ্ঞা হউক!'

সকলে বলিলেন,— 'দেবতা, গজমোতি আনিয়াছেন। তা, রাজা আমাদের, ভাইয়ের শোকে পাগল; সাতদিন সাতরাত্রি না গেলে তো দুয়ার খুলিবে না।' ত্রিশূল হাতে গজমোতি মাথায় বসন্ত, দুয়ার আলো করিয়া সাতদিন সাতরাত্রি বসিয়া রহিলেন।

আটদিনের দিন রাজা একটু ভালো হইয়াছেন, দাসী গিয়া সোনার মাছ কুটিতে বসিল। অমনি মাছেরা বলিল,—

'আঁশে ছাই, চোখে ছাই,
কেটো না কেটো না মাসি, রাজা মোদের ভাই!'

দাসী ভয়ে বটী-মটি ফেলিয়া, রাজার কাছে গিয়া খবর দিল।

রাজা বলিলেন,—

'কৈ কৈ! সোনার মাছ কৈ?
সোনার মাছ যে এনেছে সে মানুষ কৈ?'

রাজা সোনার মাছ নিয়া পড়িতে পড়িতে ছুটিয়া বসন্তের কাছে গেলেন।

দেখিয়া বসন্ত বলিলেন,— 'দাদা!'

শীত বলিলেন,— 'ভাই!'

হাত হইতে সোনার মাছ পড়িয়া গেল; শীত বসন্তের গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দুই ভায়ের চোখের জল দরদর করিয়া বহিয়া গেল।

শীত বলিলেন,— 'ভাই, সুয়ো-মা'র জন্যে দুই ভাইয়ের এতকাল ছাড়াছাড়ি।'

তিন সোনার মাছ তিন রাজপুত্র হইয়া, শীত বসন্তের পায়ে প্রণাম করিয়া বলিল,— 'দাদা, আমরাই অভাগী সুয়োরানির তিন ছেলে, আমাদের মুখ চাহিয়া মায়ের অপরাধ ভুলিয়া যান।'

শীত-বসন্ত, তিন ভাইকে বুকে লইয়া বলিলেন,— 'সে কী ভাই, তোরা এমন হইয়া ছিলি! সুয়ো-মা কেমন, বাবা কেমন?'

তিন ভাই বলিল,— 'সে কথা আর কী বলিব,— বাবা বনবাসে, মা মরিয়া গিয়াছেন; তিন ভাই ক্ষীর-সমুদ্রের তলে সোনার মাছ হইয়া ছিলাম।'

শুনিয়া শীত-বসন্তের বুক ফাটিল; চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে গলাগলি পাঁচ ভাই রাজপুরী গেলেন।

## ১২

রাজকন্যার সোনার টিয়া পিঞ্জরে ঘোরে, ঘোরে আর কেবলি কয়—

'দুঃখিনীর ধন
সাত সমুদ্র ছেঁচে এনেছে মানিক রতন!'

রাজকন্যা বলিলেন,—

'কী হয়েছে, কী হয়েছে আমার সোনার টিয়া!'

টিয়া বলিল— 'যাদু আমার এল, কন্যা, গজমোতি নিয়া!'

সত্য-সত্যই; দাসী আসিয়া খবর দিল, শীতরাজার ভাই রাজপুত্র যে, গজমোতি আনিয়াছেন!

শুনিয়া রাজকন্যা রূপবতী হাসিয়া টিয়ার ঠোঁটে চুমু খাইলেন। রাজকন্যা বলিলেন— 'দাসী লো দাসী, কপিলা গাইয়ের দুধ আন, কাঁচা হলুদ বাটিয়া আন; আমার সোনার টিয়াকে নাওয়াইয়া দিব!'

দাসীরা দুধ-হলুদ আনিয়া দিল। রাজকন্যা সোনা-রুপার পিঁড়ি, পাট-কাপড়ের গামছা নিয়া, টিয়াকে স্নান করাইতে বসিলেন।

হলুদ দিয়া নাওয়াইতে নাওয়াইতে রাজকন্যার আঙুলে লাগিয়া টিয়ার মাথার ওষুধ-বড়ি খসিয়া পড়িল।— অমনি চারিদিকে আলো হইল, টিয়ার অঙ্গ ছাড়িয়া দুয়োরানি দুয়োরানি হইলেন।

মানুষ হইয়া দুয়োরানি রাজকন্যাকে বুকে সাপটিয়া বলিলেন,— 'রূপবতী মা আমার! তোরি জন্যে আবার জীবন পাইলাম।' থতমত খাইয়া রাজকন্যা রানির কোলে মাথা গুঁজিলেন।

রাজকন্যা বলিলেন,— 'মা, আমার বড় ভয় করে, তুমি পরী, না, দেবতা, এতদিন টিয়া হইয়া আমার কাছে ছিলে?'

রানি বলিলেন,— 'রাজকন্যা, শীত আমার ছেলে, গজমোতি যে আনিয়াছে, সেই বসন্ত আমার ছেলে।'

শুনিয়া রাজকন্যা মাথা নামাইল।

## ১৩

পরদিন রূপবতী রাজকন্যা শীতরাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন,— 'দুয়ার খুলিয়া দিন, গজমোতি যিনি আনিয়াছেন তাঁহাকে গিয়া বরণ করিব।'

রাজা দুয়ার খুলিয়া দিলেন।

বাদ্য-ভাণ্ড করিয়া রূপবতী রাজকন্যার পঞ্চ চৌদোলা শীতরাজার রাজ্যে পৌঁছিল।

শীতরাজার রাজদুয়ারে ডঙ্কা বাজিল, রাজপুরীতে নিশান উড়িল,— রূপবতী রাজকন্যা বসন্তকে বরণ করিলেন।

শীত বলিলেন,— 'ভাই, আমি তোমাকে পাইয়াছি, রাজ্য নিয়া কী করিব? রাজ্য তোমাকে দিলাম।'

রাজপোশাক পরিয়া, সোনার থালে গজমোতি রাখিয়া, বসন্ত-শীত, সকলে রাজসভায় বসিলেন।

রাজকন্যার চৌদোলা রাজসভায় আসিল। চৌদোলায় রঙ-বিরঙের আঁকন, ময়ূরপাখার ঢাকন। ঢাকন খুলিতেই সকলে দেখে, ভিতরে, এক যে স্বর্গের দেবী, রাজকন্যা রূপবতীকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন!

রমরমা সভা চুপ করিয়া গেল!

স্বর্গের দেবীর চোখে জল ছল-ছল; রাজকন্যাকে চুমু খাইয়া চোখের জলে ভাসিয়া স্বর্গের দেবী ডাকিলেন,— 'আমার শীত-বসন্ত কৈ রে!'

রাজসিংহাসন ফেলিয়া শীত উঠিয়া দেখেন,— মা! বসন্ত উঠিয়া দেখেন,— মা! সুয়োরানির ছেলেরা দেখেন,— এই তাঁহাদের দুয়ো-মা! সকলে পড়িতে পড়িতে ছুটিয়া আসিলেন।

তখন রাজপুরীর সকলে একদিকে চোখের জল মোছে, আর একদিকে পুরী জুড়িয়া বাদ্য বাজে।

শীত-বসন্ত বলিলেন— 'আহা, এ সময় বাবা আসিতেন, সুয়ো-মা থাকিতেন!'

সুয়ো-মা মরিয়া গিয়াছে, সুয়ো-মা আর আসিল না; সকল শুনিয়া বনবাস ছাড়িয়া রাজা আসিয়া শীত-বসন্তকে বুকে লইলেন।

তখন রাজার রাজ্য ফিরিয়া আসিল, সকল রাজ্য এক হইল, পুরী আলো করিয়া রাজকন্যার গলায় গজমোতি ঝলমল করিয়া জ্বলিতে লাগিল। দুঃখিনী দুয়োরানির দুঃখ ঘুচিল। রাজা, দুয়োরানি, শীত, বসন্ত, সুয়োরানির তিন ছেলে, রূপবতী রাজকন্যা— সকলে সুখে দিন কাটাতে লাগিলেন।

# লালু আর ভুলু

সুখলতা রাও

দুই ভাই ছিল। ছোটটি একটু বোকা আর গরিব। বড় জন ব্যবসা করে বড়লোক হয়েছে; আর লেখাপড়াও জানে। গরিব ভাই-এর লালু আর ভুলু নামে দুটি ছোটছোট যমজ ছেলে; বড়লোক ভাই-এর ছেলেপুলে নেই।

একদিন গরিব ভাইটি, বনের ভিতরে কাঠ কাটতে গিয়ে দেখে একটা সোনার হাঁস জলের ধারে বসে আছে। হাঁসটাকে মেরে সে তার দাদার কাছে নিয়ে এল। তার দাদা গুনতে জানত। সে গুনে বুঝতে পারল যে, এ হাঁসের কলিজা যে খাবে, রোজ সকালে তার বালিশের নিচে একটি করে মোহর পাওয়া যাবে। তখন সে তার ছোট ভাইকে কিছু টাকা দিয়ে হাঁসটা তার কাছ থেকে কিনে নিল। তারপর ছোট ভাই চলে গেলে সে বাড়ির ভিতর গিয়ে স্ত্রীকে বলল, 'এই হাঁসটা এখনি আমাকে আগুনে সেঁকে দাও। হাঁসটা যেন আস্ত থাকে, একটি টুকরোও যেন না হারায়।'

বড় ভাই-এর রান্নাঘরে সেই হাঁস রান্না হচ্ছে। বড় বউ ঘরে নেই, সে হাঁসটাকে উনুনের উপর ঝুলিয়ে রেখে কোথায় গিয়েছে। ঠিক এমনি সময়ে লালু আর ভুলু খেলা করতে করতে এসে উপস্থিত হয়েছে সেখানে; আর তাদের চোখের সামনেই, সেই হাঁসের ভিতর থেকে একটা জিনিস খসে পড়ে গেছে উনুনের ধারে। ছেলেমানুষের চোখেই হল খিদে। কাজেই হাঁসের ভিতর থেকে সেই জিনিসটি পড়বামাত্র, দু ভাইয়ে ভাগ করে মুখে পুরে দিয়েছে।

ঠিক সেই সময়ে তাদের জেঠিমাও ফিরে এসেছে। ছেলে দুটিকে মুখ নাড়তে দেখে, সে ব্যস্ত হয়ে বলল, 'কী খাচ্ছিস রে?' তারা বলল, 'ওই হাঁস থেকে একটা টুকরো মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, তাই খাচ্ছি!' তখন তাদের জেঠিমা খুঁজে দেখল, হাঁসের কলিজাটিই নেই। সর্বনাশ! একটি টুকরোও যে ফেলতে মানা। এখন উপায়? সে অমনি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে আর একটা হাঁস মেরে, তার কলিজা এনে সেই হাঁসের ভিতরে ঢুকিয়ে রেখে দিল; খাবার সময়ে তার স্বামী কিছু টের পেল না। পরদিন সকালে উঠে সে প্রাণপণে খালি বালিশের নিচে হাতড়াচ্ছে। তাতে কিছু না পেয়ে, সে বালিশ-বিছানা সব ঝেড়ে তোলপাড় করে দিল। কিন্তু দিলে কী হবে? সোনার হাঁসের কলিজা তো আর সে খেতে পায়নি।

এদিকে লালু আর ভুলু ঘুম থেকে উঠেই, তাদের মা-র কাছে এসে বলছে— 'মা দেখ আমাদের বালিশের নিচে এগুলো কী ছিল।' তাদের মা দেখেন— দুটো মোহর! পরদিন সকালেও লালু আর ভুলু দেখল, তাদের বালিশের নিচে দুটো মোহর। তখন তাদের বাবু সেই মোহর নিয়ে, দাদার কাছে গিয়ে বলল, 'দেখছ দাদা, আমাদের বালিশের নিচে রোজ দুটো মোহর পাওয়া যাচ্ছে।'

বড় ভাইয়ের তখন বুঝতে বাকি রইল না যে, হাঁসের কলিজা এই ছেলে দুটোতেই খেয়েছে। তার যে হিংসাটা হল! সে তার ভাইকে বলল, 'তাই তো, তোমার ছেলে দুটোকে দেখছি ভূতে পেয়েছে। ওদের এক্ষুনি গিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দাও।' ছোট ভাইটিও এমনি বোকা, সে ভূতের নাম শুনেই কাঁপতে কাঁপতে তখনি গিয়ে, ছেলে দুটিকে তাড়িয়ে দিল।

আহা! ছোট ছেলে দুটি তখন কোথায় যায়? পথঘাট তো আর তারা কিছু জানে না; তারা ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পৌঁছল এক বনের ভিতর। সেখানে এক শিকারি তাদের দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা ছেলেমানুষ, একলা এই জঙ্গলে কী করছ?' লালু আর ভুলু বলল, 'রোজ সকালে আমাদের বালিশের নিচে থেকে একটা করে মোহর বার হয় বলে, বাবা ভূতের ভয়ে আমাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।' শিকারি বলল, 'বটে! আচ্ছা তোমরা আমার বাড়ি চল। আমি ভূতের ভয় করি না।'

ছেলে দুটিকে দেখেই শিকারির ভারি মায়া হয়েছে। সে তাদের এমনি যত্ন করে, যেন তারা তার নিজেরই ছেলে। তার যত বিদ্যা, কিছুই লালু-ভুলুকে শেখাতে বাকি রাখেনি। ছেলে দুটিও তেমনি তাকে ভালোবাসে।

দেখতে দেখতে ষোল বছর কেটে গেল। লালু-ভুলু এতদিনে বেশ বড়সড়টি হয়েছে, আর খুব আশ্চর্যরকম শিকার করতে শিখেছে। একদিন রাত্রে খেতে বসে তারা শিকারিকে বলল, 'আমরা তো এখন বড় হয়েছি, এবার আমরা নিজে রোজগার

করতে চাই।' শিকারি বলল, 'বেশ বাবা! এই তো চাই। আমি জানি তোমরা খুবই রোজগার করতে পারবে। এদেশে আর কেউ তোমাদের মতো ভালো তীর ছুড়তে পারে না।'

ছেলে দুটিকে বিদায় দেবার সময়ে, শিকারি তাদের খুব ভালো-ভালো তীর-ধনুক, নতুন শিকারির পোশাক, কিছু খাবার আর অনেকগুলো মোহর দিল। তারপর নিজের কোমরবন্ধ থেকে একখানা ছুরি বার করে বলল, 'এই ছুরিখানা নাও। যদি কোথাও গিয়ে দু-ভাইয়ের ছাড়াছাড়ি হয়, তবে ছুরিখানা সেইখানে একটা গাছে বিঁধিয়ে রেখে যেয়ো। এক ভাই অন্য ভাইয়ের খবর জানতে চাইলে ছুরির কাছে ফিরে এস। ভাই দুজনেই যদি কুশলে থাক, তাহলে ছুরির ফলার দুই দিকই চকচকে থাকবে। আর যদি একজনের কোনো বিপদ হয় তবে সে যেদিকে গিয়েছে, ছুরির সেই দিকটা মরচে পড়ে যাবে।'

শিকারির পোশাক পরে দু-ভাই কত দেশ, কত বন পার হয়ে চলেছে। যেখানে যায় সকলে তাদের তীর ছোড়া দেখে অবাক হয়ে যায়। এমনি করে অনেক ঘুরে, শেষে তারা একটা প্রকাণ্ড বনের ভিতর এসে উপস্থিত হল। এমন ঘন বন যে দু-হাত দূরেও কিছু দেখবার জো নেই! সারাদিন হেঁটে সে বন পার হওয়া গেল না; তাই সেখানে তাদের রাত কাটাতে হল।

পরদিন সকালে উঠে তাদের বড্ড খিদে পাওয়ায়, তারা তীর-ধনুক নিয়ে শিকার করতে বেরিয়েছে। হঠাৎ দেখল, তাদের সামনেই একটা সাদা ধপধপে খরগোশ। সেটাকে মারবার জন্য ধনুক ওঠাতেই, সে তাদের ভারি মিনতি করে বলল, 'আমাকে মেরো না, মেরো না, আমি তোমাদের দুটো ছানা দিচ্ছি।' এই বলে দুটি বাচ্চা এনে তাদের দিল। বাচ্চা দুটি এমন সুন্দর যে, দেখে লালু-ভুলুর মারতে ইচ্ছে হল না। তারা সে দুটিকে সঙ্গে করে নিয়ে চলল।

খানিক দূর গিয়ে, একটা শেয়ালকে দেখে তারা ধনুক উঠিয়েছে, অমনি শেয়ালটা হাতজোড় করে বলল, 'মেরো না, মেরো না। আমি আমার দুটো ছানা তোমাদের দেব।' শেয়ালও দুটো ছানা তাদের এনে দিল। সেই ছোট ছানাগুলোকে দেখে দু-ভাইয়ের দয়া হওয়াতে, সে দুটোকে তারা না মেরে, সঙ্গে করে নিল।

আরও অনেকখানি গিয়ে তারা দেখল, একটা নেকড়ে বাঘ সামনে দিয়ে যাচ্ছে। তাকে তারা মারতে যাচ্ছিল, তখন সে-ও মিনতি করে বলল, 'মেরো না, মেরো না, আমার দুটো ছানা তোমাদের দেব।' তাই দুটো নেকড়ের ছানাও তারা সঙ্গে করে নিল।

তারপর এক ভাল্লুকের সঙ্গে দেখা। তাকে তারা তীর ছুড়তে যাবে, অমনি সে বলল, 'মেরো না, মেরো না। আমার দুটো ছানা তোমাদের দেব।' লালু-ভুলু ভাবল,

'একটা ভালুক মেরে কী হবে? তার চেয়ে দুটো ভাল্লুকের বাচ্চা সঙ্গে নিলে কাজ দিতে পারে।' সেই ভেবে ভাল্লুকটাকে না মেরে, তার বাচ্চা দুটো সঙ্গে করে নিল।

এবার খানিক দূর গিয়ে, পথের মাঝখানে এক সিংহ। তা সিংহ হলে কী হয়? লালু-ভুলুকে তীর-ধনুক উঠাতে দেখে সে-ও ভয়ে জড়সড় হয়ে হাতজোড় করে বলল, 'মেরো না, মেরো না। আমি আমার দুটো ছানা তোমাদের দিচ্ছি।'

দুটো খরগোশ, দুটো শেয়াল, দুটো নেকড়ে, দুটো ভাল্লুক আর দুটো সিংহ নিয়ে, দু-ভাই বন পার হয়ে এক গ্রামে এসে রাত কাটাল।

এমনি করে জন্তুগুলো নিয়ে দু-ভাই দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। একদিন তারা বলে, 'চল, এবার আমরা দুজনে আলাদা হয়ে দু-দিকে বেড়াতে যাই।' সেখানে একটা বটগাছ ছিল, তার পূর্ব-পশ্চিম দু-দিকে দুটো রাস্তা গিয়েছে। তারা সেই বটগাছে ছুরিখানা বিঁধিয়ে রেখে, প্রত্যেকে একটা খরগোশ, একটা শেয়াল, একটা নেকড়ে, একটা ভাল্লুক আর একটা সিংহ নিয়ে দু-জন গেল দু-দিকে চলে। লালু গেল পুবে; ভুলু গেল পশ্চিমে।

এর কিছুদিন পরে লালু, তার জানোয়ারদের নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে এক শহরে এসে একটা সরাইয়ে বাসা নিল। মস্ত বড় শহর, আর একটি লোকেরও মুখে হাসি নেই। দোকানপাট সব বন্ধ; সকল বাড়ির দরজা ভেজানো, আর ভিতরে কান্নাকাটি। লালু তাতে ভারি আশ্চর্য হয়ে সরাইওলাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের শহরের লোকের কি কোনো বিপদ ঘটেছে? সকলে কাঁদছে কেন?' সরাইওয়ালা বলল, 'তুমি শিকার করে ঘুরে বেড়াও, তুমি তো কিছু খবর রাখ না। আজ যে আমাদের রাজার মেয়েকে রাক্ষসে খাবে।' লালু তখন আরও আশ্চর্য হয়ে বলল, 'রাজার মেয়েকে রাক্ষসে খাবে!' সরাইওলা উত্তর দিল, 'ওই যে পাহাড় দেখছ, ও পাহাড়ে একটা সাতমুখো রাক্ষস থাকে। প্রতি মাসে পূর্ণিমা রাত্রে তাকে একটি সুন্দরী মেয়ে দিয়ে আসতে হয়; না দিলে সে এসে সকলকে মেরেধরে আর কিছু রাখে না। একে-একে দেশের সব মেয়েগুলো গিয়েছে, এখন শুধু রাজার মেয়েটি বাকি। পাহাড়ের উপর মন্দির আছে, সে মন্দিরে আজ রাজার মেয়েকে রেখে আসা হবে। কাল সকালে রাক্ষস তাকে খাবে।' শিকারি বলল, 'তোমরা রাক্ষসকে মেরে ফেল না কেন?'

'আমরা কি আর কম চেষ্টা করেছি? কত লোক যে রাক্ষস মারতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে, তার ঠিক নেই। রাজা বলেছেন, তাঁর মেয়েকে যে রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে, তাকে তিনি রাজ্য দেবেন আর মেয়ে দেবেন।' বলল সরাইওলা।

সে রাত্রে লালু কাউকে কিছু জানাল না, ঘরেই ঘুমাল। পরদিন ভোর না হতেই, তার জন্তুদের নিয়ে সে চুপিচুপি গেল রাক্ষসের পাহাড়ে।

তখন রাক্ষসের সবে ঘুম ভাঙছে। লালুকে দেখে রাক্ষস চেঁচিয়ে উঠল, 'তুই কে রে? আমার পাহাড়ে কী করছিস?' লালু জবাব দিল, 'আমি তোর ঘাড় ভাঙতে এসেছি।' শুনেই তো রাক্ষস বিষম 'হাউমাউ' করে মুখ মেলে তাকে গিলতে গিয়েছে! লালুও অমনি এক বাণে তার একটা চোখ দিয়েছে কানা করে। তখন রাগে রাক্ষসের সাতটা নাক-মুখ আর চৌদ্দটা চোখ দিয়ে আগুন বার হতে লাগল। সে আগুনে পাহাড়ের গায়ে আগুন ধরে গেল। আর একটু হলে লালুকে-সুদ্ধ পুড়িয়ে মারত। কিন্তু তার জন্তুরা চার হাত-পায়ে ঘষে, দেখতে দেখতে সব আগুন ফেলল নিবিয়ে। লালু ততক্ষণে রাক্ষসের চৌদ্দটা চোখই কানা করে দিয়েছে। তারপর রাক্ষস মারতে আর কতক্ষণ লাগে। জন্তুগুলোই আঁচড়ে কামড়ে দিল তার অর্ধেক প্রাণ বার করে। রাক্ষস মরলে পর লালু সাতটা জিব কেটে নিল।

এতক্ষণ আর লালু চারিদিক দেখবার অবসর পায়নি। এখন দেখল, কিছু দূরে একটা মন্দির; সেই মন্দিরের দরজায় একটি মেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। লালু বুঝল এইটিই রাজার মেয়ে। তখনই জন্তুরা ছুটাছুটি করে কোথা থেকে জল নিয়ে এল, আর সেই জল মাথায় মুখে দিতেই রাজার মেয়ে উঠে বসল। সে তো প্রাণের আশা ছেড়েই দিয়েছিল; কাজেই লালুর মুখে সব কথা শুনে, আর সেই সাতমুখো রাক্ষসটা হাঁ করে মরে পড়ে আছে দেখে, তার আনন্দের সীমা রইল না। তার গলায় প্রবালের মালা ছিল; সেই মালা ছিঁড়ে তখনি সে একটুকরো বেঁধে দিল জন্তুগুলোর গলায়। সিংহের ভাগে পড়ল মাঝখনের পদ্মরাগ মণিটি। আর লালুকে রাজার মেয়ে দিল নিজের নাম লেখা হাতের আংটিটি। এতক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে; সারাদিন যুদ্ধ করে সকলেই নিতান্ত ক্লান্ত হয়েছে; কাজেই সে রাত্রিটা তাদের সেই পাহাড়ের উপরে কাটাতে হল। সকলে ঘুমাচ্ছে এবং জন্তুগুলোর একজন জেগে পাহারা দিচ্ছে।

কিন্তু সেই কাহিল শরীর নিয়ে জেগে থাকা কি সহজ? সিংহের ছিল প্রথম পাহারা, দু-দণ্ড যেতে-না-যেতেই সে ঝিমোতে লেগেছে। শেষে আর থাকতে না পেরে, ভাল্লুককে এক ঠেলা মেরে বলল, 'এই, ওঠ; আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। এবার তুই পাহারা দে।' বলে সিংহ ঘুমিয়ে পড়ল, ভাল্লুক চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসল। যত চোখ রগড়াচ্ছে, ততই তার ঘুম আর কিছুতেই ছাড়ছে না। শেষে নেকড়েকে উঠিয়ে দিয়ে, ধপাস করে শুয়ে পড়েই নাক ডাকতে লাগল।

ভাল্লুক যতক্ষণ বসে ছিল, নেকড়ে ততক্ষণও বসল না। তার আগেই সে শেয়ালকে তুলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। শেয়ালের তো তাতে রাগ হতেই পারে। পাঁচমিনিট যেতে-না-যেতেই সে খরগোশের কান ধরে টেনে বলল, 'এই কুঁড়ের বাদশা! পাহারা দিবি না? ওঠ।' কাজেই খরগোশ বেচারি আর কী করে, সে অনেক কষ্টে উঠে বসে প্রাণপণে হাই তুলতে লাগল। হাই তুলছে আর তুলছে। তুলতে

তুলতে শেষে সে একেবারে শুয়েই পড়ল। তখন আর পাহারা দেবার কেউ রইল না। আর সেই হল সর্বনাশের কারণ।

রাজার মেয়েকে মন্দিরে আনবার সময়ে, রাজা-প্রজা সকলেই কাঁদতে কাঁদতে তার সঙ্গে এসেছিল। সে দেশের মন্ত্রীর ছেলেও ছিল তাদের একজন। রাজকন্যাকে রেখে সকলে তখন চলে যায়, সেই লোকটা আর তাদের সঙ্গে যায়নি। এরপর কী হয়, তাই দেখবার জন্য সে অনেক দূরে একটা গাছে বসে ছিল। যতক্ষণ রাক্ষসে আর লালুতে যুদ্ধ হচ্ছিল, ততক্ষণ সে ভয়ে কেঁপেই সারা হয়েছে। তারপর যখন রাক্ষস মরে গিয়েছে, আর সকলে ঘুমে অচেতন, তখন সে দুষ্টু আস্তে আস্তে নেমে এসে, তলোয়ারের এক কোপে লালুর গলা কেটে, রাজার মেয়েকে তলোয়ার দেখিয়ে বলে, 'আমি যে রাক্ষস মারিনি, এ কথা রাজাকে জানতে দেবে না; যদি দাও এই তলোয়ার দিয়ে তোমার মাথা কেটে ফেলব।' তখন প্রাণের ভয়ে সে বেচারি বলে যে, এ কথা রাজাকে জানতে দেবে না।

মন্ত্রীর ছেলের বড়ই মজা। সে সকলকে গিয়ে বলেছে, 'এই দেখ, আমি রাক্ষস মেরে রাজকন্যাকে বাঁচিয়ে এনেছি।' রাজকন্যা কথা দিয়েছে, কাজেই তাকে চুপ করে থাকতে হল, আর সকলেই ভাবল যে, মন্ত্রীর ছেলেরই বাহাদুরি। রাজামশাই বেজায় খুশি হয়ে, তখনি তার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ের আয়োজন করবার হুকুম দিলেন। তখন মেয়েটি তাঁকে মিনতি করে বলল, 'বাবা আমি নিয়ম করেছি, একবছরের মধ্যে বিয়ে করব না। এই একবছর পরে তোমাদের যেমন ইচ্ছা কর।' তাতে রাজা বললেন, 'আচ্ছা, তবে একবছর পরেই বিয়ে হবে।' শুনে রাজকন্যা যেন বাঁচল, কেননা, একবছরের মধ্যে লালু ফিরে আসতে পারে।

এদিকে সেই রাক্ষসের পাহাড়ের উপরে তখনো সকলে ঘুমাচ্ছে। কখন যেন মস্ত বড় মশা এসে খরগোশের নাকে ফটাস করে কামড়িয়ে দিয়েছে। খরগোশ তাতে লাফিয়ে উঠে বসল। তখন এমন একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল যে, সে আর বলবার নয়। সকলেই কাঁদছে আর তার চেয়ে যে ছোট তার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে। সিংহ ভয়ানক রেগে ভাল্লুককে বলছে, 'তোকে খেয়েই ফেলব। কেন আমাকে জাগিয়ে দিলি না?' ভাল্লুক অমনি নেকড়েকে দাঁত খিঁচিয়ে বলছে, 'কেন আমায় জাগালি না?' নেকড়ে শেয়ালকে তেড়ে বলছে, 'কেন আমায় জাগালি না?' শেয়াল খরগোশের কান ধরে বলছে, 'কেন আমায় জাগিয়ে দিলি না?' তখন যত দোষ সব গিয়ে পড়ল খরগোশ বেচারির ঘাড়ে। সকলে মিলে তাকে মারে আর কী! সে হাতজোড় করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'আমাকে মেরো না। আমি আমাদের মনিবকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি। এখান থেকে অনেক দূরে এক পাহাড়ে ওষুধের গাছ আছে, তার শিকড় লাগিয়ে দিলে,

সবরকম কাটা জুড়ে যায়।' সকলে বলল, 'যা এখনি যা! সন্ধের মধ্যে শিকড় নিয়ে ফিরে আসতে হবে।'

তখনি তীরের মতো ছুটে গিয়ে, সন্ধ্যার ঢের আগেই খরগোশ ওষুধ নিয়ে এল। তারপর সিংহ লালুর মাথাটি তার গলায় বসিয়ে দিতে, আর খরগোশ তাতে সেই ওষুধ লাগিয়ে দিতেই, লালু চোখ মেলে উঠে বসল। উঠেই সে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কী রে! আমার মুখটা কেন পিঠের দিকে ফেরানো?' তখন তো সকলেরি চক্ষুস্থির"! সিংহ মাথাটি লালুর ঘাড়ে বসাবার সময়ে উল্টো করে বসিয়েছে। ওই যাহ্ সব মাটি। উল্টো মাথা নিয়ে বেচারা কী করে চলবে, শিকারই-বা কী করে করবে, খাবেই-বা কেমন করে। সকলে মাথায় হাত দিয়ে ভাবছে, আর বলছে, 'হায় হায়! কী উপায় হবে?' তা দেখে সিংহ বলল, 'ভাবনা কী! শিকড় তো রয়েছেই, মাথাটা আবার কেটে, সোজা করে বসিয়ে দিলেই হবে।' তাই শেষে করতে হল। তখন লালুর সব ল্যাটা চুকে গেল। সে চারিদিকে চেয়ে রাজার মেয়েকে দেখতে না পেয়ে ভাবল, 'তার বোধ হয় আমাকে ভালো লাগেনি।' এই ভেবে ভারি দুঃখিত হয়ে, সে তার জন্তুদের নিয়ে ও দেশ ছেড়ে চলে গেল।

এর ঠিক এক বছর পরে লালু ঘুরতে ঘুরতে আবার সেই শহরে এসে, সেই সরাইখানায় বাসা নিয়েছে। সেদিন শহরের বাড়ি বাড়ি লাল নিশান উড়ছে, যেন একটা খুব আনন্দের দিন। তা দেখে লালু সরাইওলাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ঠিক একবছর আগে আমি এই শহরে এসেছিলাম, তখন দেখেছিলাম শহরময় কান্নাকাটি, আর আজ দেখছি চারদিকে লাল নিশান। এর মানে কী?' সরাইওলা উত্তর দিল, 'ঠিক একবছর আগে, আমাদের রাজার মেয়েকে রাক্ষসে খাবার কথা ছিল, তাই তুমি এসে দেখেছিলে ঘরে ঘরে কান্না। তারপর আমাদের মন্ত্রীর ছেলে সেই রাক্ষসকে মেরে, রাজার মেয়েটিকে বাঁচিয়েছে; কাল তাদের বিয়ে হবে তাই এত আনন্দ!'

পরদিন রাজার মেয়ের বিয়ে। সেদিন খেতে বসে লালু সরাইওলাকে বলল, 'ছিঃ তোমাদের ভাত ভালো নয়। দেখ আমি রাজার ভাত এনে খাব।' এই বলে সে খরগোশকে হুকুম দিল, 'যাও তো খরগোশ, রাজা যে ভাত খান, আমার জন্য সেই ভাত নিয়ে এস।'

বলতেই খরগোশ পনপন করে রাজবাড়ির দিকে ছুটল। ছুটে ছুটে সে একেবারে রাজার মেয়ের ঘরে গিয়ে হাজির। তারপর রাজার মেয়ের কাছে গিয়ে, সে আস্তে আস্তে তার পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিতে লাগল। রাজার মেয়ে প্রথমে ভাবল, বুঝি তার বেড়ালটা অমন করছে; তাই সে দু-একবার ধমক দিল, 'মেনি, দুষ্টুমি করিস না।' তারপর চেয়ে দেখে— খরগোশ! খরগোশের গলায় প্রবালের হার দেখেই তাকে চিনতে পারল, আর অমনি তাকে কোলে করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোথা

থেকে এলে? তোমার মনিব কই?' খরগোশ বলল, 'আমার মনিব, যিনি রাক্ষস মেরেছিলেন, তিনি এই শহরে এসেছেন। তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন, রাজা যে ভাত খান সেই ভাত নিয়ে যাবার জন্যে।' রাজার মেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়ে, তখনি বামুনঠাকুরকে ডেকে খরগোশের সঙ্গে ভাত পাঠিয়ে দিল।

রাজার বাড়ির বামুনঠাকুর, রাজামশাই নিজে যে ভাত খান সেই ভাত নিয়ে এসেছে, সরাইওলা দেখে অবাক। লালু বলল, 'দেখছ কী? তরকারি পায়েস মিঠাই, সব এখনি আসবে। রাজার খাবার আজ আমি এখানে বসে খাব।' একে একে শিয়াল, ভাল্লুক, নেকড়ে, সিংহ সকলেই রাজবাড়ি গেল আর রাজার মেয়ে তাদের সঙ্গে বামুনঠাকুরকে দিয়ে দৈ-সন্দেশ-মিঠাই পাঠিয়ে দিল। এত খাবার এল যে, সকলে মিলে সে খাবার খেয়ে ফুরাতে পারল না। তারপর লালু সরাইওলাকে বলল, 'রাজার খাবার খেলাম দেখলে, এবার আমি রাজার বাড়ি গিয়ে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করব।' সরাইওলা বলল, 'সে কেমন করে হবে? তাঁর তো আরেকজনের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে।' সে কথায়, লালু রাক্ষসের সাতটা জিব বার করে তাকে দেখাল।

এদিকে রাজার বাড়িতে হুলুস্থুল। রাজা এসে তাঁর মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এর মানে কী মা? আজ সকাল থেকে এত সব জন্তুজানোয়ার তোমার কাছে আনাগোনা করছে কেন?' মেয়ে উত্তর দিল, 'সবই বলছি বাবা। আগে, এই জন্তুদের যিনি মনিব, তাঁকে নেমন্তন্ন করে পাঠাও।' রাজা অমনি লালুকে নিমন্ত্রণ করে আনতে সরাইখানায় লোক পাঠালেন।

তখন লালু সরাইওলাকে বলল, 'দেখলে! রাজা নিজে আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন!' তারপর সে রাজার লোককে বলল, 'রাজামশাইকে বল গিয়ে, আমাকে রাজার মতো পোশাক আর ছয় ঘোড়ার গাড়ি পাঠাতে, তবে যাব।'

রাজা এ কথা শুনে মেয়েকে গিয়ে বললেন, 'কী করি মা? সে লোক যে রাজার মতো পোশাক আর ছয় ঘোড়ার গাড়ি চায়!' মেয়ে বলল, 'দাও, ভালো হবে।'

রাজার মতো পোশাক পরে ছয় ঘোড়ার গাড়ি চড়ে যখন লালু রাজসভায় গেল, তখন সকলে তাকে দেখে মনে মনে বলল, 'আহা, কী সুন্দর!' রাজা নিজে এসে তাকে ডেকে নিলেন। সভায় ঢের লোকজন বসেছে, রাজামশাই আছেন, তাঁর মেয়ে আছে, আর আছে সেই মিথ্যাবাদী মন্ত্রীর ছেলে। লালুকে দেখেই তার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।

সে সভায়, সকলের সামনে লালু বলল, কেমন করে সে আর তার জন্তুরা মিলে রাক্ষস মারে, কেমন করে ঘুমের ভিতর কোনো দুষ্টুলোক তার গলা কেটে রাজার মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যায়, আর কেমন করে তার খরগোশের গুণে বেঁচে উঠে সে আবার ফিরে এসেছে। মন্ত্রীর ছেলে অমনি চেঁচিয়ে উঠল, 'মিথ্যা কথা!' তখন লালু

রাক্ষসের সেই সাতটা জিব বার করে সকলকে দেখিয়ে বলল, 'এই সেই রাক্ষসের জিব, আমি কেটে রেখেছিলাম। রাক্ষসের শরীর শীঘ্র পচে না, এখনো হয়তো পাহাড়ের উপর পড়ে আছে। গিয়ে দেখে আসতে পার।' রাজা তাঁর মেয়েকে বললেন, 'এ সব কথা কি সত্যি? তুমি এতদিন বলনি কেন?' মেয়ে বলল, 'সব সত্যি! বলিনি ভয়ে। মন্ত্রীর ছেলে শাসিয়েছিল, কাউকে যদি বলি, আমায় কেটে ফেলবে!'

তারপর সভাসুদ্ধ লোক ছুটল রাক্ষসের পাহাড়ে। প্রকাণ্ড সাতমুখো রাক্ষস পাহাড় জুড়ে পড়ে আছে। সাতটা মুখের হাঁয়ের ভিতর দেখা গেল, একটাতেও জিব নেই। মন্ত্রীর ছেলে তখন বলে কী, 'রাক্ষসের তো জিব থাকে না!' কিন্তু তা বললে কী হবে? রাক্ষসের মুখে তার জিবের গোড়াগুলো স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। লালুর সঙ্গের সেই সাতটা জিব সেগুলোর সঙ্গে অবিকল মিলে গেল। আর কি কারোর 'না' বলবার জো আছে? আর, 'না' বললেই-বা শোনে কে?

তখন মন্ত্রীর ছেলের মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। তারপর রাজা খুব জাঁকজমকে লালুর সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিলেন। তাঁর বয়সও হয়েছিল ঢের, কাজেই রাজ্যও সেইসঙ্গে দিয়ে দিলেন তারই হাতে।

রাজা হয়েও কিন্তু লালুর শিকারের শখ কমল না। সে প্রায়ই জন্তুদের নিয়ে শিকার করতে যেত রাজবাড়ি থেকে ক্রোশ-তিনেক দূরে। 'ডাইনির বন' বলে এক প্রকাণ্ড বন ছিল, সে বনে দিনের বেলায়ও কেউ যেতে সাহস করত না। লালু ভাবল, একদিন সেই বনে শিকার করতে হবে। এই ভেবে সে ঢের লোকজন আর জন্তুদের নিয়ে চলল ডাইনির বনে। বনের ধারে গিয়ে তারা দেখল একটি সাদা ধপধপে হরিণ সেখানে চরে বেড়াচ্ছে। হরিণ তাদের দেখেই ছুটে জঙ্গলের ভিতরে চলে গেল। লালুও অমনি জন্তুগুলোকে নিয়ে, হরিণের সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলে ঢুকল; লোকজনদের বলে গেল, 'তোমরা অপেক্ষা কর, আমি হরিণটা মেরে আসি।'

সে খ্যাপা হরিণ এমনি ছুটছে যে, তাকে কোনোমতেই ধরা যাচ্ছে না। অনেকক্ষণ ছুটে ছুটে হঠাৎ দেখা গেল আর সেটা কোথাও নেই। তখন লালুর খেয়াল হল তার পথ ছেড়ে অনেক দূরে এসে পড়েছে। ঘোর বন, তাতে সন্ধ্যা উপস্থিত। এখন আর সেখানে রাত কাটানো ভিন্ন উপায় কী? কাজেই একটা বড় গাছ খুঁজে নিয়ে, তারি তলায় সে আর জন্তুরা শোবার জোগাড় করল। জন্তুরা খুঁজে খুঁজে শুকনো কাঠ এনে প্রকাণ্ড ধুনি জ্বেলেছে। সকলে তার পাশে সবে বসেছে, এমন সময়ে গাছের উপর কে যেন বলছে 'হী-হী-হী! বড় শীত!' লালু চেয়ে দেখে, এক বুড়ি সেখানে বসে ঠকঠক করে কাঁপছে। বুড়ি আবার যখন বলল, 'হী-হী-হী! বড় শীত!' তখন লালু বলল, 'শীত করে তো আগুনের ধারে এসে বস না। ওখান থেকে হী-হী করছ কেন?' বুড়ি বলল, 'তোমার জন্তুগুলোর ভয় নামতে পারছি না।' লালু বলল, 'জন্তুরা কিছু বলবে

না।' বুড়ি তখন 'তার চেয়ে এক কাজ কর; এই ডালটা ওদের ছুঁইয়ে দাও, তা হলেই ওরা আমাকে কিছু বলতে পারবে না।' বলে সেই গাছের একটা ডাল ভেঙে নিচে ফেলে দিল। লালু সে ডাল দিয়ে জন্তুগুলোকে ছুঁইয়ে দেবামাত্র তারা পাথর হয়ে গেল। ততক্ষণে দুষ্টু বুড়ি গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি সেই ডাল ছুঁইয়ে লালুকেও ফেলল পাথর বানিয়ে।

ওদিকে সঙ্গের লোকেরা বনের ধারে সারারাত বসে আছে— তাদের রাজা আর আসে না! পরদিন তারা রানিকে গিয়ে খবর দিল, 'কাল একটা সাদা হরিণ তাড়া করে রাজা ডাইনির বনে ঢুকেছেন, আর আসেননি।' রানি কেঁদে সারা হতে লাগল, কিন্তু রাজা এল না।

এদিকে হয়েছে কী— ভুলুও এতদিন তার সিংহ, ভাল্লুক, নেকড়ে, শেয়াল আর খরগোশ নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক রকম দেখছে, শিখছেও ঢের; এখন সে একটু একটু জাদুবিদ্যাও জানে। এর মধ্যে একদিন হঠাৎ তার খেয়াল হল একবার ছুরিটা গিয়ে দেখে আসতে। ভাই না জানি কেমন আছে; এই ভেবে ভুলু সেই বটগাছের নিচে এল, যেখানে তারা ছুরি বিঁধিয়ে রেখে গিয়েছিল। সেখানে এসে দেখে, ছুরিখানার এক পিঠের অর্ধেকটা মরচে পড়ে গিয়েছে। তখন সে মনের দুঃখে অস্থির হয়ে বলতে লাগল, 'হায় হায়! না জানি তার কী বিপদ হয়েছে!' যা হোক সে এটুকুও বুঝতে পারল যে, ছুরির সবটাতে যখন মরচে ধরেনি, শুধু অর্ধেকটায় ধরেছে, তখন লালু নিশ্চয় বেঁচে আছে। এই ভেবে সে সেই পুবদিকের রাস্তা ধরে, প্রাণপণে লালুর সন্ধানে ছুটে চলল। ছুটতে ছুটতে ভুলু একেবারে লালুর রাজধানীতে এসে উপস্থিত। সিংহদরজায় পাহারাওলা দাঁড়িয়ে আছে, ভুলুকে তারা দেখেই যারপরনাই ব্যস্ত আর খুশি হয়ে সেলাম করে বলল, 'মহারাজ, আসুন আসুন! রানিমা আপনার জন্য কেঁদে কেঁদে সারা হলেন।' ভুলু তখনই বুঝল যে, এরা লালু ভেবেই তাকে ডাকছে। সে দেখতে ঠিক লালুরই মতো, আর তার সঙ্গেও একটা সিংহ, একটা ভাল্লুক, একটা নেকড়ে, একটা শেয়াল আর একটা খরগোশ আছে। সে পাহারাওলাদের কিছু না বলে, সোজাসুজি ঢুকল গিয়ে রাজবাড়িতে; আর অমনি 'রাজা এসেছেন রাজা এসেছেন' বলে ভয়ানক হৈ-চৈ পড়ে গেল। রানি তাকে দেখে মনে করেছে সে লালু। তার এত আনন্দ হল যে বলবার নয়। 'কী হয়েছিল?' 'কোথায় গিয়েছিলে?' এইসব কত কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল সে। ভুলু মহা মুশকিলে পড়ল। এসব কথার কী উত্তর দেবে? তাই সে নানান কাজের ছল করে একটু দূরে-দূরে থাকে, আর লালুর খবর জানতে বিধিমতো চেষ্টা করে। ক্রমে সে এইটুকু জানল যে লালু একটা সাদা হরিণ তাড়িয়ে নিয়ে ডাইনির বনে ঢুকেছিল, আর ফেরেনি। জেনে, সে লোকজন আর জন্তুদের নিয়ে উপস্থিত হল সেই ডাইনির বনে।

লালু যেমন দেখতে পেয়েছিল ভুলুও ঠিক তেমনি দেখল, বনের ধারে একটা সাদা হরিণ দাঁড়িয়ে। ভুলুও লোকজনদের বাইরে রেখে কেবল জন্তুদের নিয়ে হরিণের পিছুপিছু বনের ভিতর গিয়ে ঢুকল, আর হরিণটা ঠিক লালুর মতো তাকেও হয়রান করে হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেল আর দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে এল। ভুলু কিনা— জাদু জানে, সে অমনি বুঝেছে, 'এ ডাইনির মায়া।' তারপর তারা রাত কাটাবার জন্য একটা গাছের নিচে আগুন জ্বালাতেই, গাছের উপর থেকে সেই বুড়ি বলছে, 'হী-হী-হী! বড় শীত!' তাকে দেখে ভুলু ডাইনি বলে চিনতে পেরে বলল, 'শীত লাগে তো নেমে আয় না। গাছে বসে হী-হী করলে কী হবে?' ডাইনি বলল, 'আগে তোমার জন্তুগুলোকে তাড়াও না, ওরা কামড়ে দেবে।' ভুলু বলল, 'আমি জন্তু তাড়াব না; তুই নামবি তো নাম, না হলে তীর ছুড়ব।' বুড়ি বলল, খুব চেঁচিয়ে হেসে, 'হাঃ— হা। মার দেখি তীর।'

ভুলু তখনি সবচেয়ে ধারালো দেখে একটা তীর বুড়িকে ছুড়ে মারল। কিন্তু তীরে বুড়ির কিছুই হল না। সে তীর বরং তার গায়ে ঠেকে ভোঁতা হয়ে ফিরে এল, যেন লোহায় ঠেকেছে! তখন ভুলুর মনে পড়ল যে, ডাইনিদের শুধু আগুনে পুড়িয়ে মারা যায়, তীর বর্শা তলোয়ারে তাদের কিছু হয় না। ভুলু অমনি তার জন্তুদের দিয়ে বোঝা বোঝা কাঠ আনিয়ে, সেই গাছের নিচে প্রকাণ্ড আগুন জ্বেলে ফেলল। আগুন দেখেই তো বুড়ি কেঁপে চেঁচিয়ে অস্থির— 'দোহাই বাবা, দোহাই তোমাদের! আমি এখুনি নামছি।'

'তবে শিগগির নেমে আয়, আর আমার ভাইকে কী করেছিস বল!' বলতেই বুড়ি কাঁপতে কাঁপতে নেমে এসে, সেই গাছের একটা ডাল চারিদিকের পাথরগুলোকে ছুঁইয়ে দিতে লাগল। অমনি লালু আর জন্তুরা, আর তাদের সঙ্গে আরো কত লোক, সে পাথর থেকে উঠে দাঁড়াল।

তখন একটা আনন্দের আর কোলাকুলির ধুম পড়ে গেল চারিদিকে। সকলে তাতেই ব্যস্ত, এর মধ্যে যে বুড়ি কখন সরে পড়েছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়ঙ্কর বনও কোথায় চলে গেছে, তা কেউ টের পায়নি। কী আশ্চর্য, দিনের আলোও ফুটেছে! বাড়ি ফিরবার পথে দু-ভাই পরামর্শ করল, 'একটা মজা করা যাক। আমরা দুজনেই ঠিক একরকম দেখতে, দুজনেরই রাজবেশ, আর দুজনেরই সঙ্গে একই রকম জন্তু আছে। চল আমরা একজন উত্তরদিকে, আর একজন দক্ষিণদিকের দরজা দিয়ে গিয়ে বাড়িতে ঢুকি। দেখি সকলে কী করে!'

এদিকে বুড়ো রাজা তাঁর মেয়েকে নিয়ে সভায় বসেছেন, মেয়েই তো তখন দেশের রানি। তিনি অপেক্ষা করছেন ভুলুর জন্য, কখন সে শিকার থেকে ফিরবে। এই সময়ে উত্তর দরজার প্রহরী এসে বলল, 'রাজা আসছেন!' ঠিক একই সময়ে

দক্ষিণ দরজার প্রহরীও এসে বলল, 'রাজা আসছেন!' বুড়ো রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কী রকম! তুমি উত্তর দরজার প্রহরী, তুমি বলছ, 'রাজা আসছেন'! আর তুমি দক্ষিণ দরজার প্রহরী, তুমিও বলছ, 'রাজা আসছেন'! কার কথা ঠিক? রাজা কোন্ দরজা দিয়ে আসছেন? উত্তর দরজার প্রহরী উত্তর করল, 'আজ্ঞে, উত্তর দরজা দিয়ে।' দক্ষিণ দরজার প্রহরী উত্তর করল, 'আজ্ঞে না, দক্ষিণ দরজা দিয়ে।' বলতে বলতেই সভাঘরে দুইদিক দিয়ে দু-ভাই এসে উপস্থিত হয়েছে। বুড়ো রাজা অবাক, রানি অবাক, সভাসুদ্ধ সকলে অবাক! শেষে বুড়ো রাজা তাঁর মেয়েকে বললেন, 'মা তুমিই চিনে নাও কে আসল রাজা।' রানিও প্রথমটায় মহা মুশকিলে পড়ে ছিল, শেষে হঠাৎ তার চোখ পড়ল লালুর সিংহের গলায় তার দেওয়া সেই পদ্মরাগ মণিটির উপর। তাই দেখে সে চিনে ফেলল লালুকে। আর তখন কী আনন্দই যে হল! সাতদিন ধরে কেউ আর লাফিয়ে ছাড়া চলেনি, সুর করে বই কথা কয়নি।

# সাত ভাই চম্পা

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

এক ছিলেন রাজা, তাঁহার সাত রানি। রানিদের কাহারও ছেলেপিলে ছিল না, তাই রাজার ভারি দুঃখ!

একদিন রাজা মৃগয়া করিতে গিয়াছেন, এমন সময় চর আসিয়া খবর দিল, 'সুয়োরানির সুন্দর সাতটি ছেলে ও একটি মেয়ে হয়েছে।' শুনিয়া, রাজার আনন্দ আর ধরে না। তাড়াতাড়ি মৃগয়া সারিয়া বাড়ি ফিরিলেন।

এদিকে এক কাণ্ড হইয়াছে। সুয়োরানি রাজার প্রিয় বলিয়া আর ছয় রানি তাঁহাকে হিংসা করিত। রাজা ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই তাহারা সেই আটটি শিশুকে পাঁশগাদায় পুঁতিয়া ফেলিল। রাজা আসিয়া ছেলে-মেয়েদের দেখিতে চাহিলে, তাহারা ব্যাঙ, ইঁদুর, কাঁকড়া, বিছা প্রভৃতি ধরিয়া আনিয়া বলিল, 'এই দেখ, তোমার সুয়োরানির সাধের ছেলে-মেয়ে!'

দুষ্টু রানিদের কৌশলে রাজার মাথা ঘুরিয়া গেল। রাগে গরগর করিতে করিতে তিনি সুয়োরানিকে রাজবাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিলেন। আহা! দুঃখিনী আর কী করিবেন, কোথায় যাইবেন— ঘুঁটেকুড়ানি দাসী হইয়া পথে পথে ঘুরিতে লাগিলেন!

কিছুকাল পরে, রাজার বাপের শ্রাদ্ধ উপস্থিত— ফুলের দরকার। মালী ফুল আনিতে গিয়া দেখে, সারা বাগান শুকনা— ফুল তো দূরের কথা, কোথাও একটি কুঁড়িও নাই। সে আর কী করিবে, ভয়ে ভয়ে ফিরিয়া আসিতেছে, এমন সময়

দেখিল— পাঁশগাদায় সাতটি সুন্দর চাঁপাগাছ ও একটি পারুল গাছ হইয়াছে। আর প্রতি গাছে একটি করিয়া সুন্দর ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ফুলগুলি দেখিয়া মালীর বড়ই আনন্দ হইল; কিন্তু সে যেই হাত বাড়াইয়াছে, অমনি পারুল ফুলটি চাঁপা ফুলগুলিকে বলিয়া উঠিল :—

সাত ভাই চম্পা জাগ রে!

চাঁপারা উত্তর করিল : কেন বোন পারুল ডাক রে?

পারুল। রাজার মালি এসেছে,
ফুল দিবে কি না দিবে?

চাঁপা। না দিব না দিব ফুল,
উঠিব শতেক দূর;
আগে আসুক রাজা,
তবে দিব ফুল।

ফুলগুলির কথা শুনিয়া মালী তো একেবারে অবাক! সে রাজাকে গিয়া সকল কথা বলিল। রাজা আশ্চর্য হইয়া নিজেই ফুল তুলিতে আসিলেন; কিন্তু যেই হাত বাড়াইয়াছেন, অমনি শুনিতে পাইলেন :

পারুল। সাত ভাই চম্পা জাগ রে!

চাঁপা। কেন বোন পারুল ডাক রে!

পারুল। রাজা নিজে এসেছে,
ফুল দিবে কি না দিবে?

চাঁপা। না দিব না দিব ফুল, উঠিব শতেক দূর;
আগে আসুক বড়রানি, তবে দিব ফুল।

তখন রাজার হুকুমে ঘুঁটেকুড়ানি দাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুয়োরানি হাত বাড়াইতেই, ফুলগুলি সুন্দর সাতটি ছেলে ও একটি মেয়ের বেশ ধরিয়া তাঁহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

ব্যাপার দেখিয়া সকলে অবাক। রাজা শিশুগুলিকে কাছে ডাকিয়া, তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তাহারা একবাক্যে বলিল, 'আমরা তোমার ছেলে-মেয়ে; সুয়োরানি আমাদের মা। তুমি যখন মৃগয়া করতে যাও, তখন আমরা ভূমিষ্ঠ হই। কিন্তু মায়ের উপর হিংসে করে তোমার অন্য ছয় রানি আমাদিগকে পাঁশগাদায় পুঁতে রেখেছিলেন। আমরা সেখানে চাঁপা ও পারুল গাছে ফুল হয়ে ফুটেছিলাম।'

শিশুগুলির কথা শুনিয়া চোখের জলে রাজার বুক ভাসিতে লাগিল। এমন সোনার চাঁদ ছেলে-মেয়ে থাকিতে এতদিন কী কষ্টেই-না তাঁহার দিন কাটিয়াছে! আর দুঃখিনী

সুয়োরানিকে কী ভয়ানক যন্ত্রণাই না সহ্য করতে হইয়াছে! ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে তিনি আগুন হইয়া উঠিলেন! তখন ছয় রানির কাঁপুনি যদি দেখিতে! রাজা তাহাদিগকে 'হেঁটে কাঁটা— উপরে কাঁটা' দিয়া পুঁতিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দিলেন। তারপর সুয়োরানিকে লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন।

আমার কথাটি ফুরুল;
নটে গাছটি মুড়ল—
ইত্যাদি।

# রাজার অসুখ

সুকুমার রায়

এক ছিল রাজা। রাজার ভারি অসুখ। ডাক্তার-বদ্যি-হাকিম-কবিরাজ সব দলে দলে আসে আর দলে দলে যায়— তা কেউ বলতে পারে না, অসুখ সারাতেও পারে না।

সারাবে কী করে? অসুখ তো আর সত্যিকারের নয়। রাজামশাই কেবলই বলেন 'ভারি অসুখ', কিন্তু কোথায় যে অসুখ তা আর কেউ খুঁজে পায় না! কত রকমের কত ওষুধ রাজামশাই খেয়ে দেখলেন, কিছুতেই কিছু হল না। মাথায় বরফ দেওয়া হল, পেটে সেঁক দেওয়া হল, কিন্তু অসুখের কোনো কিনারাই হল না।

তখন রাজামশাই গেলেন খেপে। তিনি বললেন— 'দূর করে দাও এই অপদার্থগুলোকে, আর ওদের পুঁথিপত্র যা আছে সবকিছু কেড়ে নিয়ে জ্বালিয়ে দাও।'

এমনি করে চিকিৎসকেরা বিদায় হলেন। ভয়ে আর কেউ রাজার বাড়ির দিকেও যায় না। তখন সকলের ভাবনা হল, তাই তো, শেষটায় কি রাজামশাই বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন?

এমন সময় কোথা থেকে এক সন্ন্যাসী এসে বলল— 'অসুখ সারাবার উপায় আমি জানি, কিন্তু সে ভারি শক্ত। তোমার কি সে সব করতে পারবে?'

মন্ত্রী, কোটাল, সেনাপতি, পাত্রমিত্র সবাই বলল— 'কেন পারব না? খুব পারব। জান দিতে হয় জান দেব!'

তখন সন্ন্যাসী বলল— 'প্রথমে এমন একটি লোক খুঁজে আনো যার মনে কোনো ভাবনা নেই, যার মুখে হাসি লেগেই আছে, যে সব সময়ে, সব অবস্থাতেই খুশি থাকে।'

সবাই বলল— 'তারপর?'

সন্ন্যাসী বলল— 'তারপর সেই লোকের গায়ের জামা যদি রাজামশাই একটা দিন পরে থাকেন, আর সেই লোকের তোশকে যদি একরাত্রি ঘুমিয়ে থাকেন, তাহলেই সব অসুখ সেরে উঠবে।'

সবাই শুনে বলল— 'এ তো চমৎকার কথা।'

তাড়াতাড়ি রাজামশাইয়ের কাছে খবর গেল। তিনি শুনে বললেন— 'আরে এই সহজ উপায়টা থাকতে এতদিন সবাই মিলে করছিল কী? এটা কারো মাথায় আসেনি? যাও, এখনি খোঁজ করে সেই হাসি-ওলা লোকটার জামা আর তোশক নিয়ে এস।'

চারদিকে লোক ছুটল, রাজ্যময় 'খোঁজ-খোঁজ' রব পড়ে গেল, কিন্তু সে লোকের আর সন্ধান পাওয়া যায় না! যে যায় সেই ফিরে আসে আর বলে, 'যার দুঃখ নেই, ভাবনা নেই, সর্বদাই হাসিমুখ, সর্বদাই খুশি মেজাজ, কই, তেমন লোকের তো দেখা পাওয়া গেল না!' সবার মুখে একই কথা।

তখন মন্ত্রীমশাই রেগে বললেন— 'এদের দিয়ে কি কোনো কাজ হয়? এ মূর্খেরা খুঁজতেই জানে না।' এই বলে তিনি নিজেই বেরোলেন সেই অজানা লোকের খোঁজ করতে।

বাজারের কাছে মস্ত এক দালানের সামনে তিনি দেখলেন, মেলা লোক জমে গিয়েছে আর এক বুড়ো শেঠজি হাসিমুখে তাদের চাল, ডাল, পয়সা আর কাপড় দান করছে।

মন্ত্রী ভাবলেন, বাহ, এই লোকটাকে তো বেশ হাসি-খুশি দেখাচ্ছে, ওর তো অনেক টাকা পয়সাও আছে দেখছি। তাহলে আর ওর দুঃখই-বা কিসের, ভাবনাই-বা কিসের? ওরই একটা জামা আর তোশক চেয়ে নেওয়া যাক।

মন্ত্রীমশাই এইরকম ভাবছেন, ঠিক সেই সময়ে একটা ভিখারি করেছে কী, ভিক্ষা নিয়ে শেঠজিকে সেলাম না করেই চলে যাচ্ছে! আর শেঠজির রাগ দেখে কে! তিনি ভিখারিকে গাল দিয়ে, জুতো মেরে, তার ভিক্ষা কেড়ে তাকে তাড়িয়ে দিলেন। ব্যাপার দেখে মন্ত্রীমশাই মাথা নেড়ে সেখান থেকে সরে পড়লেন।

তারপর নদীর ধারে এক জায়গায় তিনি দেখলেন একটা লোক ভারি মজার ভঙ্গি করে নানারকম হাসির গান করছে আর তাই শুনে চারদিকের লোকেরা হো-হো করে হাসছে। মানুষ যে এতরকম হাসির ভঙ্গি করতে পারে তা মন্ত্রীমশায়ের জানা ছিল না। তিনি লোকটার গান শুনে আর তামাশা দেখে একেবারে হেসে অস্থির হয়ে উঠলেন আর ভাবলেন, এমন আমুদে লোকটা থাকতে কিনা আমার লোকগুলো সব হতাশ হয়ে ফিরে যায়! তিনি পাশের একটি লোককে জিজ্ঞাসা কররেন— 'এই লোকটা কে হে?'

সে বলল— 'ও হচ্ছে গোবরা মাতাল। এখন দেখছেন কেমন খোশ মেজাজে আছে, কিন্তু সন্ধ্যা হলেই ওর মাতলামি, চেঁচামেচি আর উৎপাত শুরু হয়। ওর ভয়ে পাড়ার লোক তিষ্ঠোতে পারে না।'

শুনে মন্ত্রীমশাই গম্ভীর হয়ে আবার চললেন সেই লোকটির সন্ধানে। সারাদিন খুঁজে খুঁজে মন্ত্রীমশাই সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরলেন, কিন্তু সে লোকের সন্ধান কোথাও মিলল না। এমনি করে দিনের পর দিন তিনি খোঁজ করেন আর দিনের পর দিন হতাশ হয়ে বাড়ি ফেরেন।

তাঁর উৎসাহ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, এমন সময়ে হঠাৎ এক গাছতলায় তিনি একটা পাগলা গোছের বুড়ো লোকের দেখা পেলেন। লোকটার মাথাভরা চুল, মুখভরা দাড়ি, সমস্ত শরীর যেন শুকিয়ে দড়ি হয়ে গিয়েছে।

মন্ত্রী বললেন— 'তুমি এত হাসছ কেন?'

সে বলল— 'হাসব না? পৃথিবী বনবন করে ঘুরছে, গাছের পাতা সরে সরে যাচ্ছে, মাঠে মাঠে ঘাস গজাচ্ছে, রোদ উঠছে, বৃষ্টি পড়ছে, পাখিরা গাছে এসে বসছে, আবার সব উড়ে যাচ্ছে। এসব চোখের সামনে দেখছি আর হাসি পাচ্ছে!'

মন্ত্রী বললেন— 'তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু শুধু বসে বসে হাসলে তো আর মানুষের দিন চলে না। তোমার কি আর কোনো কাজকর্ম নেই?'

ফকির বলল— 'তা কেন থাকবে না? সকালবেলায় নদীতে যাই, সেখানে স্নান-টান সেরে, লোকজনের যাওয়া-আসা কথাবার্তা এইসব তামাশা দেখে, আবার গাছতলায় এসে বসি। তারপর, যেদিন খাওয়া জোটে খাই, যেদিন জোটে না খাই না। যখন বেড়াতে ইচ্ছা হয় বেড়াই, যখন ঘুম পায় তখন ঘুমাই। কোনো ভাবনা-চিন্তা, হট্টগোল কিছুই নেই। ভারি মজা!'

মন্ত্রী খানিক মাথা চুলকিয়ে বললেন— 'যেদিন খাওয়া পাও না সেদিন কী কর?'

ফকির বলল— 'সেদিন তো কোনো ল্যাঠাই নেই! চুপচাপ পড়ে থাকি আর এইসব তামাশা দেখি। বরং যেদিন খাওয়া হয়, সেদিনই হাঙ্গামা বেশি। ভাত মাখরে, গ্রাস তোলরে, মুখের মধ্যে ঢোকাওরে, চিবোওরে, গেলোরে,— তারপর জল খাওরে, আঁচাওরে, হাত-মুখ মোছরে! কত রকম কাণ্ড!'

মন্ত্রী দেখলেন, এতদিনে ঠিকমতন লোক পাওয়া গিয়েছে। তিনি বললেন— 'তোমার গায়ের এক-আধখানা জামা দিতে পার? তার জন্য তুমি যত ইচ্ছা দাম নাও, আমরা দিতে প্রস্তুত আছি।'

শুনে লোকটা হো হো করে হাসতে লাগল, বলল— 'আমার আবার জামা। এই সেদিন একটি লোক একটি শাল দিয়েছিল, তা-ও তো ছাই ভিখারিকে দিয়ে ফেললাম। জামা-টামার ধারই ধারি না কোনোদিন।'

মন্ত্রী বললেন— 'তাহলে তো মহা মুশকিল! যদি-বা একটা লোক পাওয়া গেল, তারও আবার জামা নেই। আচ্ছা, তোমার বিছানার তোশকখানা দিতে পার? কত দাম চাও বল, আমরা টাকা ঢেলে দিচ্ছি।'

এবারে ফকির হাসতে হাসতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার হাসি আর থামেই না। অনেকক্ষণ হেসে তারপর সে বলল— 'চল্লিশ বছর বিছানাই চোখে দেখলাম না, তা আবার তোশক আর গদি!'

মন্ত্রীমশাই বড় বড় চোখ করে বললেন— 'জামাও গায়ে দাও না, লেপ-কম্বল বিছানাও সঙ্গে রাখ না, তোমার কি অসুখও করে না ছাই?'

ফকির বলল— 'অসুখ আবার কী? অসুখ-টসুখ ওসব আমি বিশ্বাস করি না। যারা কেবল অসুখ-অসুখ ভাবে, তাদেরই খালি অসুখ করে।'

এই বলে ফকির আবার গাছে হেলান দিয়ে ঠ্যাং মেলে খুব হাসতে লাগল।

মন্ত্রীমশাই হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। রাজার কাছে খবর গেল। রাজা মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন, তার কাছে সব কথা শুনলেন, শুনে মন্ত্রীমশাইকে বিদায় দিলেন।

আবার সবাই ভাবতে বসল, এখন উপায় কী হবে? চিকিৎসাও হল না, অনেক কষ্টে যা একটা উপায় পাওয়া গেল, সেটাও গেল ফসকে!

সবাই বসে বসে এ ওর মুখ চায়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আর বলে— 'নাহ, আর তো বাঁচাবার উপায় দেখছি না।'

ওদিকে রাজামশাই ভাবতে বসেছেন— 'আমি থাকি রাজার হালে, ভালো ভালো জিনিস খাই, কোনো কিছুর অভাব নেই, লোকেরা সবসময়ে তোয়াজ করছেই— আমার হল অসুখ! আর ওই হতভাগা ফকির, যার চাল-চুলো কিচ্ছু নেই, জামা নেই, কম্বল নেই, গাছতলায় পড়ে থাকে, যা পায় তাই খায়— সে কিনা বলে, অসুখ-টসুখ কিছু মানেই না! সে ফকির হয়ে অসুখ উড়িয়ে দিতে পারল, আর আমি রাজা হয়ে পারব না?'

তার পরদিনই রাজা ঘুম থেকে উঠে পাত্র-মিত্র সবাইকে ডেকে বললেন— 'যা হতভাগা মুখ্যুগুলো সব, সভায় বসগে যা! তোরা কেউ কিছু করতে পারলি না, এখন এই দেখ আমার অসুখ আমি নিজেই সারিয়ে দিয়েছি। আজ থেকে আবার সভায় গিয়ে বসব। আর যে টুঁ শব্দটি করবে তার মাথা উড়িয়ে দেব!'

# পরীর চুমু

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

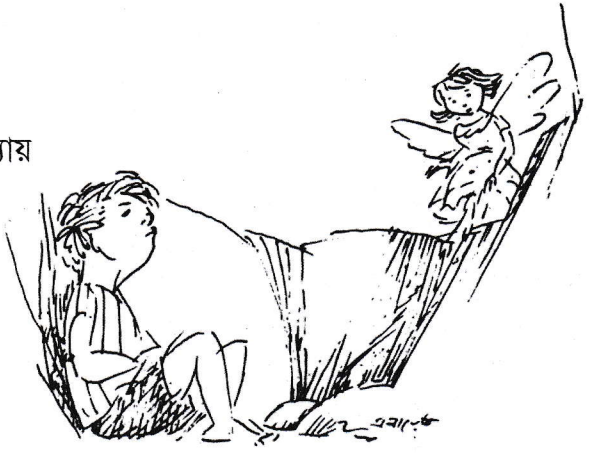

অনেক, অনেক দিন আগের কথা। তখন চাঁদ থেকে ছোট ছোট পরী নেমে এসে পৃথিবীতে খেলা করে বেড়াত। বনের মধ্যে চাঁদের আলোয় কেউ কেউ তাদের দেখতে পেত— মৌমাছির মতো স্বচ্ছ পাতলা ডানা মেলে তারা বনের অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ত; আর তাদের দেখা যেত না।

যে বনের মধ্যে পরীরা খেলা করতে আসত সেই বনের ধারে একটি বাড়ি ছিল; বাড়িতে একটি ছেলে থাকত, তার নাম মঞ্জু। মঞ্জুর বয়স মোটে ছয় বছর, কিন্তু তার মনে ভারি দুঃখ; বাড়িতে তার খেলার সাথি একটিও নেই। মা-বাবা আছেন বটে, কিন্তু তাঁরা মঞ্জুর সঙ্গে খেলা করেন না। মঞ্জু বাড়ির মধ্যে একলাটি ঘুরে বেড়ায় আর একটু সুবিধা পেলেই বনের মধ্যে পালিয়ে যায়। বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে তার বড় ভালো লাগে। সেখানে তার খেলার সাথি নেই বটে, কিন্তু বনের যত পশুপক্ষী সবাই মঞ্জুকে বড্ড ভালোবাসে;— খরগোশেরা মঞ্জুকে দেখে লাফালাফি করে তাকে ঘিরে নাচে; কাকাতুয়া উঁচু গাছের ডাল থেকে গলা বাড়িয়ে কথা কয়; কাঠবেড়ালি পাকা ফলটি তার পায়ের কাছে ফেলে দেয়; ফড়িং লাফিয়ে লাফিয়ে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। এরা সবাই মঞ্জুর বন্ধু, কিন্তু তবু একটি মানুষ-বন্ধুর জন্য মঞ্জুর মন কেমন করতে থাকে।

বনের মধ্যে কেবল একটা রূপী বানর আছে, সে মঞ্জুকে দেখতে পারে না। মঞ্জুর সঙ্গে দেখা হলেই সে উপর থেকে তাকে মুখ ভ্যাংচায়, কিচির-মিচির করে ঝগড়া

করে। মঞ্জুও তাকে ঢেলা ছুড়ে মারে— তখন সে এ ডাল থেকে ও ডালে লাফাতে লাফাতে পালায়।

আবার মঞ্জুকে বিপদে ফেলবার জন্য রূপী বানরটা জঙ্গলের মধ্যে গর্তের উপর লতাপাতা ঢাকা দিয়ে ফাঁদ পেতে রাখে, যাতে মঞ্জু তার মধ্যে পড়ে যায়। কিন্তু মঞ্জু সে সব গর্তে পড়ে না। ফড়িং তাকে সাবধান করে দেয়, বলে,— 'হুঁশিয়ার! ওদিক দিয়ে যেয়ো না, দুষ্টু রূপীটা তোমার জন্য ফাঁদ পেতে রেখেছে।' রূপী তাই শুনে গাছের ডাল থেকে মুখ বিকৃত করে ফড়িংকে গালাগালি দেয়। রূপী ভারি বজ্জাত।

একদিন মঞ্জু বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেদিন কিন্তু ফড়িং কাকাতুয়া খরগোশ কাঠবেড়ালি কারুর সঙ্গে তার দেখা হল না। ফড়িঙের বোধহয় বাচ্চা হয়েছে, তাই সে বেরুতে পারেনি; খরগোশেরা রাত্রে চাঁদের আলোয় অনেকক্ষণ পর্যন্ত লুকোচুরি খেলেছিল, তাই তাদের ঠাণ্ডা লেগে গেছে— তারা গর্তের মধ্যে গলায় গলাবন্ধ জড়িয়ে শুয়ে আছে; কাকাতুয়াদের বনের অন্যধারে সভা বসেছিল— তারা সবাই সেখানে গিয়েছে। কাঠবেড়ালি তার ছোট খোকার জন্য ফল খুঁজতে বেরিয়েছিল,— শুকনো ফল খেয়ে খেয়ে খোকার অরুচি হয়েছে, তাই তাজা ফল খাবার জন্য সে বায়না ধরেছে।

একলা বনে বেড়াতে বেড়াতে মঞ্জুর মন উদাস হয়ে গেল। সে ভাবতে লাগল— আহা, আমার যদি একটি খেলার সাথি থাকত, দু-জনে মিলে কেমন খেলা করতুম!

এই কথা ভাবতে ভাবতে মঞ্জু চলেছিল, হঠাৎ সে একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। দুষ্টু রূপীটা গর্তের মুখ এমনভাবে লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রেখেছিল যে, কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়ে মঞ্জু আবার উঠবার চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু চৌবাচ্চার মতো গর্তের ধারগুলো এমন উঁচু আর খাড়া যে, সে আর উঠতে পারলে না। রূপীটা আহ্লাদে আটখানা হয়ে গাছের ডাল থেকে ঝুঁকে কিচমিচ করে বলতে লাগল, 'কেমন মজা! এবার বাড়ি যাবি কেমন করে? বেশ হয়েছে, এখন গর্তের মধ্যে বসে থাক! কেমন জব্দ! আর বনের মধ্যে আসবি?'

পড়ে গিয়ে মঞ্জুর হাঁটুতে একটু লেগেছিল; সে বসে হাঁটুতে হাত বুলোতে লাগল আর ভাবতে লাগল— কী করে সে বাড়ি যাবে! তার মা তাকে অনেকক্ষণ দেখতে না পেয়ে কত ভাববেন, তার বাবা বনে বনে খুঁজে বেড়াবেন। ক্রমে রাত্রি হবে, চারিদিক অন্ধকার হয়ে যাবে। তার বিছানাটি খালি পড়ে থাকবে। মা কাঁদবেন, 'মঞ্জু! মঞ্জু!' বলে ডাকবেন। কিন্তু সে সাড়া দিতে পারবে না। এমনি কত রাত কেটে যাবে— তবু সে এই গর্তের মধ্যে পড়ে থাকবে— বেরুতে পারবে না।

ভাবতে ভাবতে মঞ্জুর ভারি কান্না পেতে লাগল; সে চোখ মুছতে মুছতে ফোঁপাতে লাগল, আর মনে মনে ডাকতে লাগল— 'মা! মা! মা!'

তারপর, অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কখন মঞ্জু ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙতেই উপরদিকে চোখ তুলে মঞ্জু দেখলে— একটি ছোট্ট মেয়ে গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। মঞ্জু অবাক হয়ে বড় বড় চোখ মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'তুমি কে?'

মেয়েটি ঠোঁটের একটি করুণ ভঙ্গি করে বললে, 'আমি পরী।' বলে পাখনা মেলে উড়ে এসে মঞ্জুর সামনে দাঁড়াল।

মঞ্জু ভারি আশ্চর্য হয়ে গেল। বললে, 'তুমি উড়তে পার!'

পরী বললে, 'হ্যাঁ— তুমি বুঝি গর্ত থেকে উঠতে পারছ না? এস তোমাকে উপরে নিয়ে যাই।' বলে মঞ্জুর দু-হাত ধরে উড়তে উড়তে উপরে নিয়ে এল।

তারপর দুজনে হাত ধরাধরি করে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। দু-জনেই প্রায় সমান— পরী বরং মঞ্জুর চেয়ে একটু খাটো। বনের বড় বড় গাছের তলায় আলো-অন্ধকারের ভিতর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে মঞ্জুর ভারি আহ্লাদ হতে লাগল, সে পরীকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কোথা থেকে এলে? এতদিন আসনি কেন?'

দুজনে একটি ফুলে-ভরা লতার নিচে গিয়ে বসল। মঞ্জু বললে, 'তুমি চলে গেলে আমি কার সঙ্গে খেলা করব?'

পরীরও মঞ্জুকে বড় ভালো লেগেছিল, মঞ্জুকে ছেড়ে যেতে তারও ইচ্ছা হচ্ছিল না; সে একটু ভেবে বললে— 'আচ্ছা, কাজ কর না, তুমিও আমার সঙ্গে পরীর দেশে চল না! সেখানে আমার মতন আরো অনেক খেলার সাথি পাবে।'

মঞ্জু বললে, 'কিন্তু আমি যে উড়তে পারি না, চাঁদে যাব কেমন করে?'

পরী হাসতে হাসতে বললে, 'সে কিছু শক্ত নয়; আমি এক্ষুনি তোমার ডানা গজিয়ে দিতে পারি, তুমিও আমার মতন পরী হয়ে যাবে।'

মঞ্জু ভারি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী করে?'

পরী বললে, 'আমি যদি তোমায় চুমু খাই, তাহলেই তুমি পরী হয়ে যাবে; আমার মতোন তোমারও পাখনা গজাবে।'

মঞ্জু ভাবলে, পরী ঠাট্টা করছে। তা-ও কি কখনো হয়, মা তো মঞ্জুকে কত চুমু খান, কই তার পাখনা গজায় না তো!

সে বললে, 'যাহ, সে কী হয়!'

পরী বললে, 'দেখবে?— এই বলে লতায় যে সব ফুল ফুটেছিল, তারই একটিতে সে চুমু খেলে। ফুলটি অমনি প্রজাপতি হয়ে রঙিন ডানা মেলে উড়ে গেল। মঞ্জু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। পরী বললে, 'দেখলে?— তুমি পরী হবে?'

মঞ্জু ভাবতে লাগল। পরী হবার তার খুব ইচ্ছা, কিন্তু পরী হলে যদি মা'র কাছে থাকতে না পায়! মা তার জন্য কাঁদবেন— 'মঞ্জু মঞ্জু' বলে ডাকবেন, আর সে তাঁর কাছে যেতে পাবে না— এ কষ্ট মঞ্জু কী করে সহ্য করবে?

সে জিজ্ঞাসা করলে, 'পরী হলে আমি মা'র কাছে থাকতে পাব?'

পরী মাথা নেড়ে বললে, 'না। তোমাকে তখন পরীর দেশে গিয়ে থাকতে হবে। পরীদের মানুষের সঙ্গে কথা কওয়া মানা। তুমি ছোট মানুষ, তাই আমি তোমার সঙ্গে কথা কয়েছি।'

মঞ্জু আবার ভাবতে লাগল। খেলার সাথি পেতে হলে মাকে হারাতে হয়। কিন্তু মাকে ছেড়ে সে তো কিছুতেই থাকতে পারবে না! তাই, ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে সে বললে, 'না, আমি পরী হব না; আমি মা'র কাছে থাকব।'

পরী মুখখানি বিষণ্ন করে বললে, 'আমরা রোজ রাত্রে চাঁদ উঠলে এই বনে খেলা করতে আসি। চাঁদ হচ্ছে আমাদের বাড়ি— সেখানেই আমরা থাকি। কাল রাত্রে খেলা করতে করতে আমি একটি লতার ঝোপে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুম ভেঙে দেখলুম, চাঁদ অস্ত গিয়েছে, আমার সঙ্গীরা সব চলে গেছে; আমি একলাটি বনের মধ্যে পড়ে আছি।' পরীর রাঙা রাঙা পাতলা ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

মঞ্জু পরীর গলা জড়িয়ে বললে, 'আমি তোমার সঙ্গে খেলা করব— তুমি কেঁদো না। আমার একটিও খেলার সাথি নেই, আজ থেকে তুমি আমার সাথি হলে। সন্ধ্যাবেলা আমরা দু-জনে বাড়ি ফিরে যাব, এক বিছানায় শুয়ে ঘুমুব— মা তোমায় কত আদর করবেন— তারপর সকালবেলা এখানে এসে আবার আমরা খেলা করব। কেমন?'

পরী দুঃখিতভবে মাথা নেড়ে বললে, 'না, আজ রাত্রে চাঁদ উঠলে আমার সখিরা ফিরে আসবে, তখন আমি তাদের সঙ্গে বাড়ি যাব।'

মঞ্জুর মুখ ম্লান হয়ে গেল। পরীকে সে অনেক অনুনয় করলে, কিন্তু বাড়ির জন্য পরীর মন কেমন করছিল, সে থাকতে রাজি হল না।

পরীরও মনে মনে ভারি দুঃখ হল, কিন্তু সে আর কিছু বললে না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছিল; পরী মঞ্জুর হাত ধরে তার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। যাবার সময় মঞ্জুর ইচ্ছা হল পরীকে একটা চুমু খেয়ে ফেলে; কিন্তু মা'র কথা মনে পড়তেই আর তা পারলে না। বাড়ি যেতে যেতে ছলছল চোখে কেবল পরীর পানে ফিরে ফিরে চাইতে লাগল। পরীর-ও মঞ্জুকে একলাটি ফেলে যেতে ইচ্ছা করছিল না, সে বললে— 'মঞ্জু, যদি পরী হবার ইচ্ছা হয়, চাঁদ উঠলে বনের মধ্যে যেয়ো।' এই বলে পরী বনে ফিরে গেল।

সেই যে দুষ্টু রূপী বানরটা— সে গাছের উপর থেকে মঞ্জু আর পরীর সব কথা শুনেছিল আর পরীর চুমুতে ফুল কেমন প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেল তা-ও মিটমিট করে দেখেছিল, তার ভারি লোভ হল পরী হবার জন্য। কিন্তু পরীর চুমু না পেলে তো আর পরী হওয়া যায় না; তাই সে লুকিয়ে পরীর পিছনে পিছনে ঘুরতে লাগল। তার মতলব— সুবিধা পেলেই পরীকে চুমু খেয়ে নিজে পরী হয়ে যাবে।

পরী মঞ্জুকে পৌঁছে দিয়ে সেই লতার তলায় এসে বসল। তখন রূপী এক-পা এক-পা করে তার কাছে এসে বাঁদুরে-মুখে হাসি এনে বললে, 'পরী, তোকে আমি বড় ভালোবাসি, তুই আমায় একটা চুমু খাবি?'

পরীর একেই তো মন খারাপ ছিল, তার ওপর রূপীর এই কথা শুনে তার আরও রাগ হল, সে বললে, 'দূর হ দুষ্টু! পাজি কোথাকার!' বলে মাটি থেকে একটা নুড়ি তুলে নিয়ে তাকে ছুড়ে মারলে। রূপী ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে কিচির-মিচির করতে করতে পালিয়ে গেল।

ক্রমে রাত্রি হল। পুব আকাশে গাছের মাথায় চাঁদ উঠল; তখন একঝাঁক পরী খেলা করবার জন্য চাঁদ থেকে নেমে এল। তারা 'সুধা সুধা' বলে ডেকে ডেকে বনময় খুঁজে বেড়াতে লাগল। যে পরীটির সঙ্গে মঞ্জুর ভাব হয়েছিল, তার নাম ছিল— সুধা।

খুঁজতে খুঁজতে শেষে পরীরা দেখল, একটি ফুলে ভরা লতার নিচে সুধা চুপটি করে শুয়ে আছে।

সকলে সুধাকে ঘিরে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল— 'কী হয়েছে? কাল রাত্রে ফিরে যাওনি কেন? অমন মুখ ভার করে বসে আছে কেন?' কিন্তু সুধা উত্তর দেয় না, মঞ্জুর জন্য তার মন কেমন করছে।

শেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর সুধা সব কথা বললে। শুনে পরীদের মধ্যে মন্ত্রণা-সভা বসল। একটি পরী— তার নাম কণা— বললে, 'মঞ্জু রাত্তিরে এসে আমাদের সঙ্গে খেলা করে না কেন।' সীধু নামে একটি পরী বললে, 'সে যে মানুষ! সে রাত্তিরে ঘুমোয়।' সকলে বললে, 'তবে উপায়?...'

একটি পরী— তার নাম লেখা— তার ভারি বুদ্ধি, সে বললে : এস, এক কাজ করি। এখন রাত্তির হয়েছে— মঞ্জু ঘুমুচ্ছে। সুধা চুপি চুপি গিয়ে চুমু খেয়ে তাকে পরী করুক। তখন মঞ্জু আর মানুষের সঙ্গে মিশতে পারবে না— আমাদের দলের একজন হয়ে যাবে। আমরা তাকে নিয়ে চাঁদে চলে যাব।'

সকলে বললে, 'এই ঠিক হয়েছে— এই বেশ হয়েছে!'

তখন সকলে সুধাকে মঞ্জুর বাড়ির দিকে পাঠিয়ে দিলে। সুধা উড়তে উড়তে গিয়ে মঞ্জুর জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলে, মঞ্জু একলাটি বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। সে পা টিপে ঘরে ঢুকল। মঞ্জুর ঘুমন্ত মুখে চাঁদের আলো পড়েছে— সে স্বপ্নে হাসছে; বোধহয় পরীদের সঙ্গে খেলার স্বপ্ন দেখছে!

সুধা তার বিছানায় ঝুঁকে তার ঠোঁটে একটি চুমু খেলে। অমনি— আশ্চর্য ব্যাপার! মঞ্জু পরী হল না!

সুধার পাখনা দুটি পিঠ থেকে খসে মাটিতে পড়ে গেল। তার চোখদুটো জড়িয়ে এল; সে মঞ্জুর পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পরীরাজ্যের কথা আর তার মনে রইল না। সে পরী ছিল— মঞ্জুর ঠোঁটের পরশ পেয়ে মানুষ হয়ে গেল।

রূপী বানরটা পরীদের মন্ত্রণা শুনেছিল, সে-ও সুধার পিছন পিছন এসেছিল। জানালা দিয়ে সে উঁকি মেরে দেখলে, মঞ্জু আর পরী পাশাপাশি শুয়ে ঘুমুচ্ছে। তার ভারি কৌতূহল হল; সে গুটি-গুটি ঘরের মধ্যে ঢুকল।

ঘরে ঢুকে দেখলে, পরীর পাখনা দুটি মাটিতে পড়ে আছে। সে ভাবলে— এই তো ঠিক হয়েছে, আর আমায় পায় কে? এবার আমি পরী হব— এই ভেবে পাখনা দুটি নিজের পিঠে জুড়ে দিলে।

পরীর পাখনা দুটি রূপীর পিঠে জুড়ে গেল বটে, কিন্তু সে পরী হতে পারলে না। রূপী ভারি দুষ্টু, তাই সে পরীও হল না, রূপী বানরও রইল না,— বাদুড় হয়ে আকাশে উড়ে বেড়াতে লাগল।

ওদিকে পরীরা অনেকক্ষণ সুধার পানে চেয়ে রইল। কিন্তু সুধা ফিরল না। তখন চাঁদ অস্ত যায় দেখে তারা সবাই চলে গেল।

অনেক রাত্রে মা মঞ্জুকে দেখতে এলেন। দেখলেন, মঞ্জুর পাশে একটি ফুটফুটে সুন্দর ছোট্ট মেয়ে ঘুমুচ্ছে।

তিনি অনেকক্ষণ তাদের শিয়রে দাঁড়িয়ে তাদের মুখের পানে চেয়ে রইলেন। তারপর একটু হেসে আস্তে আস্তে দুজনেরই কপালে চুমু খেলেন।

# আঙুর-পরী ডালিম-পরী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

এক রাজা। প্রকাণ্ড তাঁর রাজ্য। হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ভাণ্ডারে সোনা-দানা হীরা-মুক্তার ছড়াছড়ি। রাজার প্রতাপে রাজ্য গমগম। রাজ্যটি কিন্তু রাজার নিজের নয়; অপর এক রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়েছেন— পুরনো রাজা-রানিকে কেটে, তাঁদের রাজ্য নিষ্কণ্টক ভোগ করছেন।

চাঁপার কলির মতো পুরনো রাজার দুটি কচি মেয়ে ছিল; নতুন রাজা এক ডাইনি-বুড়ির হাতে তাদের দিয়ে বলেছিলেন, 'বনের মধ্যে এদের পুঁতে রেখে আয়।'

রাজ্যের সীমানায় মায়াবন। ডাইনি-বুড়ি চাঁপার কলির মতো মেয়ে দুটিকে নিয়ে সেই যে মায়াবনে ঢুকেছিল, আর ফিরে আসেনি।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। পুরনো রাজা-রানি আর রাজকন্যাদের কথা কারো মনে নেই। নতুন রাজা রাজত্ব করেন। তাঁর দুই ছেলে বড় হয়ে উঠেছেন, তাঁদের নাম— বড় কুমার আর ছোট কুমার। সোনার কার্তিকের মতো তাঁদের চেহারা; ফুলের মতো তাঁদের মন। রাজা-রানি তাঁদের দেখেন— আর চোখ জুড়িয়ে যায়।

রাজা ভাবেন, আহা, পুরনো রাজার মেয়ে দুটি যদি থাকত, এদের সঙ্গে বিয়ে দিতুম। রাজার মনে দুঃখ হয়।

রানি ভাবেন, আহা, অন্য কোনো রাজা এসে যদি আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়ে আমার সোনার চাঁদ ছেলে দুটিকে বনে পুঁতে রেখে আসে! আতঙ্কে তাঁর গা কাঁপে।

রাজা-রানি কারো মনে সুখ নেই।

একদিন রাজা একলা মায়াবনে মৃগয়া করতে গেলেন। প্রকাণ্ড বন; গাছে-লতায় আলো-ছায়ায় জড়াজড়ি। হাতি শুঁড় দুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়; হরিণ শিঙের বাহার নিয়ে ছুটোছুটি করে; আরো কত জন্তুজানোয়ার বনে থাকে। কিন্তু সেদিন রাজা ঘোড়ায় চড়ে শিকার খুঁজে বেড়ালেন, মায়াবনের হরিণ চোখের সামনে বাতাসে মিলিয়ে গেল, মারতে পারলেন না; মায়াবনের ময়ূর পেখমের ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল, রাজা ধরতে পারলেন না।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে রাজা শেষে এক লতার ঝোপের কাছে গিয়ে ঘোড়া থামালেন। পিপাসায় তাঁর বুক শুকিয়ে গেছে— কিন্তু জল কোথায়? ক্ষুধায় নাড়ি চুঁইয়ে গেছে— কিন্তু কী খাবেন? রাজার ক্লান্ত হাত থেকে বল্লম খসে পড়ল।

ঘোড়া থেকে নেমে রাজা এদিক-ওদিক চাইলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, একটি আঙুরের লতা, একটি ডালিমগাছকে জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে। আঙুরলতায় এক-থোলো পাকা আঙুর ঝুলছে, আর ডালিম ফলে আছে একটা।

রাজা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন; লতা থেকে আঙুর পেড়ে খেয়ে ফেললেন। তৃষ্ণা নিবারণ হল, ক্ষুধাও মিটল। তারপর ডালিমফলটি পেড়ে আবার ঘোড়ায় চড়ে রাজা রাজপুরীতে ফিরে চললেন।

সন্ধেবেলা রাজা পুরীতে ফিরে গেলেন। রাজার হাতে মায়াবনের রাঙা টুকটুকে ডালিম দেখে রানি বললেন, 'ওমা! অত সুন্দর ডালিম কোথায় পেলে?'

রাজা বললেন, 'তোমার জন্যে বন থেকে এনেছি।'

রানি ভারি খুশি হয়ে ডালিমটি ভেঙে খেলেন।

দিন কাটতে লাগল। ক্রমে রাজার শরীর খারাপ; রানির শরীরে বল নেই। কবিরাজ এলেন। কিন্তু রাজা-রানির কী রোগ হয়েছে কেউ বলতে পারে না। রাজা ও রানি রাত্রিবেলা অকাতরে ঘুমোন, কিন্তু দিনের বেলা তাঁদের শরীরে স্বস্তি নেই। কী যেন তাঁদের শরীরের মধ্যে বসে গুমরে গুমরে কেঁদে বলে, 'মুক্তি দাও। কেন আমাদের বন থেকে ধরে নিয়ে এলে!'

রাজা-রানির আহার নেই; দিন দিন তাঁরা শুকিয়ে যেতে লাগলেন। রাজ্যময় সবার দুশ্চিন্তা, রাজা-রানি বুঝি আর বাঁচবেন না।

রাজা বললেন, 'মনে নেই? পরের রাজ্য কেড়ে নিয়ে— পরের মেয়ে দুটিকে বনে পুঁততে পাঠিয়েছিলে? সেই পাপে আমাদের এই দশা! কিন্তু আমরা মরি সে ভালো, আমাদের ছেলেরা যেন সুখে থাকে!' ক্রমে রাজা-রানির অবস্থা যায় যায়; বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। তাই দেখে রাজকুমারদের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। ছোট কুমার বললেন, 'দাদা, মা-বাবা তো চললেন। এস, দু-জনে বাপ-মায়ের সেবা করি।'

বড় কুমার বললেন, 'হ্যাঁ ভাই, এস, তাই করি। প্রাণ দিয়েও যদি বাবা-মাকে বাঁচাতে পারি, তা-ও করব।'

দুই কুমার প্রাণপণে রাজা-রানির সেবা করেন। রাত্রে রাজা-রানি পালঙ্কে শুয়ে ঘুমোন, দুই ভাই জেগে পাহারা দেন। ক্রমে রাত্রি গভীর হয়, রাজপুরী নিশুতি হয়ে আসে। রাজকুমারদের চোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে আসে; তাঁরা পালঙ্কের শিথানে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন।

এমনিভাবে রাত কাটে। দুপুররাত্রে রাজার ঘরে কী ঘটে কেউ জানতে পারে না। হঠাৎ একদিন নিঝুম রাত্রে রাজকুমারদের ঘুম ভেঙে গেল। তাঁরা চোখ মেলে দেখেন— ঘুমন্ত রাজার নাক থেকে বেরিয়ে এল সবুজ রঙের একটি ছোট্ট পরী; আর রানির নাক থেকে বেরিয়ে এল ডালিমফুলের মতো রাঙা একরত্তি একটি পরী। রাজপুত্রেরা মিটিমিটি চেয়ে দেখলেন, ছোট্ট পরী দুটি মেঝেয় নেমে খেলা করতে লাগল... হাত ধরাধরি করে মনের আনন্দে নাচতে লাগল। দুই রাজকুমার তখন চুপিচুপি উঠে পরীদের ধরে ফেললেন; তারা আর পালাতে পারল না।

বড় রাজকুমার বললেন, 'তোমরা কে?'

সবুজ-পরী বললে, 'আমি আঙুর-পরী।'

রাঙা-পরী বললে, 'আমি ডালিম-পরী।'

ছোট রাজকুমার বললেন, 'তোমরা কোথায় থাক?'

সবুজ-পরী বললে, 'আমি রাজার পেটের মধ্যে থাকি।'

রাঙা-পরী বললে, 'আমি রানির পেটের মধ্যে থাকি। আমরা দুই বোন। দিনের বেলা রাজা-রানি জেগে থাকেন তাই বেরুতে পারি না; রাত্রে তাঁরা ঘুমোলে দু-জনে বেরিয়ে খেলা করি।'

বড় কুমার বললেন, 'বুঝেছি। তোমাদের জন্যেই মা-বাবার অসুখ। তোমাদের মেরে ফেলব।'

আঙুর-পরী আর ডালিম-পরী তখন কাঁদতে লাগল; বললে, 'আমাদের মেরো না; আমরা কোনো দোষ করিনি। মায়া-বনে আমরা আঙুর আর ডালিম হয়ে ফলেছিলুম। বাতাস এসে আমাদের দোলা দিত— আমরা মনের সুখে খেলা করতুম। রাত্রে লতায়-পাতায় জড়াজড়ি করে ঘুমিয়ে থাকতুম। একদিন রাজা মৃগয়া করতে গিয়ে আঙুর পেড়ে খেলেন আর ডালিমটি রানির জন্যে নিয়ে এলেন। সেই থেকে আমরা তাঁদের পেটের মধ্যে আছি।'

বড় কুমার বললেন, 'তবে উপায়?'

দুই কুমার গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন।

তারপর ছোট কুমার বললেন, 'চল দাদা, ওদের চুপিচুপি মায়াবনে রেখে আসি।'

বড় কুমার বললেন, 'সেই ভালো।'

দুই রাজপুত্র তখনি ঘোড়ায় চড়ে বেরুলেন। বড় কুমার আঙুর-পরীকে নিজের পাগড়ির মধ্যে বেঁধে নিলেন, ছোট কুমার ডালিম-পরীকে কোমরবন্ধে লুকিয়ে নিলেন। মায়াবন অনেক দূর; যেতে-যেতে সকাল হয়ে গেল।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে উঠে রাজা-রানি দেখেন, রাজকুমারেরা নেই, ঘোড়ায় চড়ে মায়াবনে চলে গেছেন। তাঁরা ভাবলেন, কুমারেরা তাঁদের পাপের কথা জানতে পেরেছেন, তাই রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন। রাজা বুক চাপড়াতে লাগলেন; রানি কপালে কঙ্কণ মারলেন। রাজ্যে কারো প্রাণে সুখ রইল না; রাজকুমারদের সকলেই ভালোবাসতেন, দুঃখে-শোকে সকলে হায়-হায় করতে লাগলেন।

এদিকে দুই রাজপুত্র মায়াবনে গিয়ে পৌঁছুলেন। কিন্তু কোথায় ডালিমগাছ? কোথায় আঙুরলতা? খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা সেই জায়গায় গেলেন। দেখলেন, ডালিম-গাছ, আঙুরলতা কিছুই নেই; বনের হাতি আঙুরলতা উপড়ে ফেলে দিয়েছে, বনের শজারু ডালিম গাছের শিকড় খেয়ে গেছে। চারিদিক শূন্য; কেউ কোথাও নেই! একটা ফড়িং কি ভোমরা পর্যন্ত নেই। কাকে জিজ্ঞাসা করেন?

এদিকে-ওদিকে চাইতে চাইতে ছোট কুমার দেখলেন, তুঁতগাছের ডালে রেশমের একটি গুটি ঝুলছে। তিনি গুটির কাছে গিয়ে বললেন, 'গুটিপোকা, গুটিপোকা, বলতে পার, আঙুরলতা কোথায়? ডালিমগাছ কোথায়?'

গুটির ভেতর থেকে পোকা বললে, 'আঙুরলতা নেই, ডালিমগাছ নেই, হাতিতে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে, শজারু গোড়া খেয়ে গেছে।'

বড় কুমার বললেন, 'তবে উপায়? আঙুর-পরী ডালিম-পরীকে তাহলে রাখি কোথায়?'

রাজকুমারদের ভারি ভাবনা হল। কোথায় রাখেন পরীদের? বনে ছেড়ে দিলে হয়তো ইঁদুরে-বাঁদরে তাড়া করবে নয়তো চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। তখন কী হবে? রাজকুমারদের বড় দয়া হল। আহা, ছোট্ট পরী দুটিকে কী করে বনে ফেলে যাবেন!

তাঁরা ভাবতে লাগলেন।

তখন গুটিপোকা বললে, 'রাজকুমার, আমি তোমাদের চিনি; পরীদেরও চিনি। আমারই পাপে ওরা একরত্তি পরী হয়ে বনে লুকিয়ে ছিল। তোমরা ওদের উদ্ধার কর।'

রাজকুমারেরা অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি কে?'

গুটিপোকা বললে, 'আমি ডাইনি-বুড়ি। তোমদের বাবার হুকুমে আমি পুরনো রাজার দুই মেয়েকে এনে মাটিতে পুঁতেছিলুম; তাই আমি গুটিপোকা হয়ে নিজের জালে জড়িয়ে বন্ধ হয়ে আছি। আর যাদের মাটিতে পুঁতেছিলুম তারা আঙুর আর ডালিমগাছের ফল হয়েছিল। তোমরা ওদের উদ্ধার কর।'

দুই কুমার বললেন, 'কী করে উদ্ধার করব?'

গুটিপোকা বললে, 'রক্ত দিয়ে... বুকের রক্ত দিয়ে। রাজার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, তবেই রাজকন্যারা উদ্ধার পাবে।'

বড় কুমার কোমর থেকে তলোয়ার বার করে নিজের বুকে মারলেন... এক ঝলক রক্ত মাটিতে পড়ল। অমনি দেখতে দেখতে আঙুর-পরী পরমাসুন্দরী রাজকন্যা হয়ে সামনে দাঁড়াল!

ছোট কুমার কোমর থেকে তলোয়ার নিয়ে নিজের বুকে মারলেন... এক ঝলক রক্ত মাটিতে পড়ল। অমনি ডালিম-পরী রাঙা টুকটুকে রাজকুমারী হয়ে তাঁর পানে চেয়ে হাসতে লাগল।

বড় কুমার বললেন, 'এ কী আশ্চর্য ব্যাপার!'

ছোট রাজকুমার বললেন, 'এত সুন্দর রাজকুমারী তো কখনো দেখিনি!'

আঙুর-কুমারী হাসতে হাসতে নিজের গলা থেকে মুক্তার মালা নিয়ে বড় কুমারের গলায় পরীয়ে দিল। ডালিম-কুমারী লজ্জায় রাঙা হয়ে নিজের গলার মালা ছোট কুমারের গলায় দিল।

তখন দুই রাজপুত্র দুই রাজকন্যাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে রাজ্যে ফিরে গেলেন।

নিরানন্দ রাজ্য আবার হেসে উঠল।

রাজপুরীতে সানাই বাজল।

রাজার আর অসুখ রইল না। তিনি ছুটতে ছুটতে এসে ছেলেদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রাজকন্যাদের দেখে বললেন, 'আহা কী সুন্দর মেয়ে! এরা কারা?'

কুমারেরা বললেন, 'ওরা পুরনো রাজার কন্যা। মায়াবন থেকে উদ্ধার করে এনেছি।'

শুনে আনন্দে রাজার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

রানি-মা অন্দরমহল থেকে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে ছেলেদের বুকে নিলেন; দুটি ফুলের মতো রাজকন্যাকে দেখে বললেন, 'এ কাদের এনেছিস বাবা?'

কুমারেরা হেসে বললেন, 'তোমার জন্যে দাসী এনেছি।'

রানি দুই বউকে কোলে নিয়ে চুমু খেলেন। রাজ্যে জয়ডঙ্কা বেজে উঠল। রাজা-রানির বুকে আহ্লাদ ধরে না। দুই রাজকুমার দুই পরমাসুন্দরী রাজকন্যা নিয়ে আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন। রাজ্যে কারো মনে দুঃখ রইল না।

তারপর একদিন রাজ্য দুই ভাগ করে দুই কুমারকে দিয়ে রাজা বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন; রানিকে নিয়ে মায়াবনে কুটির বেঁধে শান্তিতে বাস করতে লাগলেন।

* * *

ডাইনি-বুড়ি গুটিপোকা হয়ে আরো অনেকদিন গাছে ঝুলে রইল। যেদিন তার পাপ ক্ষয় হল সেদিন সে গুটি কেটে একটি কালো প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেল।

# ডালিমকুমার

জসীমউদ্‌দীন

## আরম্ভ

একালের কথা নয় সে, হাজার বছর আগে,
যখনেতে রাজার বাড়ি শুকশারিকা জাগে;
বেগুনতলায় বাজার বসে লঙ্কাতলায় হাট,
টুনটুনিরা দোকান দিত বিছিয়ে সোনার খাট;
লক্ষ বছর, তারো আগে নিরিবিলির পাড়ে,
কহকুণ্ড পাখির বাসা শিমুল গাছের ঘাড়ে।
সেই দেশে এক রাজা, তাহার দুইটি রানি ঘরে,
মন্ত্রী কোটাল সঙ্গে লয়ে সুখে রাজ্য করে।

রাজা বলতে রাজা— সোনার থালায় ভাত, রুপোর গেলাসে রুপোর জল, সোনার খাটে শুয়ে রুপোর খাটে পা মেলে রাজা সোনার স্বপন দেখে। রাজার বাড়িতে হীরে, মণি, চুনি, পান্না, কাঞ্চন, জহরৎ, রোদে শুকাতে শুকাতে রাজার একহাজার দাসী হয়রান হয়ে গেল।

রাজার দুই রানি। সুয়োরানি আর দুয়োরানি। দুই রানির চন্দন ঘষতে ঘষতে রাজবাড়ির দশহাজার দাসীর হাত অবশ হয়ে গেল। দুই রানির গায়ের গয়না গড়াতে গড়াতে দশহাজার সোনারু দিনরাত হাপুস-হুপুস।

রাজার হাতিশালায় হাতি, ঘোড়াশালায় ঘোড়া, লোক-লস্কর পেয়াদা পাইক— সবসময় রাজার বাড়ি গমগম করে, ঝমঝম করে।

রাজার এত থাকতেও কিচ্ছু নেই, রাজার বাড়িতে নেই ছোট্ট এতটুকুন, তুলতুলে টুকটুকে, ফুটফুটে, কোলে নেওয়া যায়, আদর করা যায়, সোনা বলা যায়, লক্ষ্মী বলা যায়, মাণিক বলা যায়, চাঁদ এনে চাঁদের চুমো চাঁদমুখো মাখিয়ে দেওয়া যায়, একেবারে জুঁইকুঁড়িটির মতো, সাগরের ফেনার মতো, ছোট্ট এতটুকুন একরত্তি একটি খোকন।

রাজবাড়ির ময়ূরপঙ্খী ঘোড়া গজমোতি হাতিকে ডেকে বলে, 'তাই তো রে ভাই! সোনার বরণ একটা রাজার ছেলে যদি থাকত, তাকে পিঠে করে ছুটে চলে যেতাম সেই তেপান্তরের মাঠে। সেখানে এক সোনার বরণ রাজকন্যাকে বিয়ে করে রাজপুত্র ফিরে আসত ঘরে, রাজবাড়িতে জয়ডঙ্কা বাজত, রাজপুরীতে জয়-জোকার পড়ত, কী মজাই না হত।'

গজমোতি হাতি ময়ূরপঙ্খী ঘোড়াকে বলে, 'আরে ভাই, রাজবাড়ির হীরা, মণি, পান্না খেয়ে খেয়ে দাঁতগুলো ক্ষয়ে গেল— পিঠটা কেবল উঠ-বস করছে। সোনার বরণ একটা রাজার ছেলে যদি থাকত এক্ষুনি চলে যেতাম তাকে পিঠে করে হরিণ শিকারে।'

রাজার বাগান ভরা ফুল— বাতাসে হেলে রৌদ্রে খেলে; সোনার বরণ একটা রাজার ছেলে থাকলে ফুলের মালা গেঁথে গলায় পরত।

রাজার বাড়িতে একটা ছোট্ট খোকন নেই। রাজার মনে সুখ নেই, রানির মনে সুখ নেই, মন্ত্রীর মনে সুখ নেই, কোটালের মনে সুখ নেই, হাওলাদারের মনে সুখ নেই, পাঞ্খাবরদারের মনে সুখ নেই— তবু রাজার দিন কাটে সুখে-দুঃখে।

একদিন স্তব্ধ দুপুরবেলা— খাঁ খাঁ করে রৌদ্র, রাজবাড়ির দেউড়িতে লকলক ঝকঝক তলোয়ার কোমরে গুঁজে সিপাই-শান্ত্রিরা ঘুমে ঢুলছে, এমন সময় রাজবাড়িতে এক ফকির এসে—

দম দম মন্দার বলে হাঁকিল জিকির।

সুয়োরানি দুয়োরানি পা এলিয়ে দিয়ে গল্প করছিল। ফকিরের ডাক শুনে দুয়োরানি যেমনটি বসেছিল তেমনটি বসে রইল। সুয়োরানি তাড়াতাড়ি উঠে সোনার থালায় এক মুষ্টি সোনা, ধান-দূর্বা, সোয়া সের আতপ-চাল, একটা কাঁচকলা সাজিয়ে আপনার দাসীকে ডাক দিল।

রানি— ওগো দাসী!

দাসী— কী বলছেন মহারানি!

রানি— দরজায় ফকির দাঁড়িয়ে আছে, এই নাও, সোনার থালায় সোনার মুষ্টি ভরে দিলাম, ফকিরকে দিয়ে এস।

দাসী— তবে আমি যাই।...ওগো ফকির!

ফকির— তুমি কে?

দাসী— আমি রাজবাড়ির দাসী।

ফকির— রাজবাড়ির মাসি?

দাসী— মাসি নয়, দাসী।

ফকির— আসি আসি বলছ? কোথায় যাবে?

দাসী— কোথায় মুখপোড়া। আমি রাজবাড়ির দাসী মোক্ষদা সুন্দরী।

ফকির— কী বল্লে মোক্ষদা সুন্দরী তুমি রাজবাড়ির দাসী?

দাসী— হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি রাজবাড়ির দাসী। আমাদের রানিমা সোনার থালায় সোনার মুষ্টি ভিক্ষে দিয়েছেন। জীবনে সোনা দেখেছ কোনো দিন?

ফকির— ওগো দাসী, আমি ভিক্ষা নেব না।

দাসী—

ওরে আমার হাবাদাবা
ওই মুখে বাতাসা খাবা!

টাকা পেলে কাঠের পুতুল হা করে। একমুঠো সোনা দিয়েছে রানিমা— তা-ও তোমার পছন্দ হল না?

ফকির— ওগো দাসী, তুমি জেনে জান না;

ভিক্ষার কাঙাল নই আমি ভিক্ষা মেগে খাই,
ঘরে ঘরে মা-জননী ডাকিয়া বেড়াই।

সে মা-জননী জগৎ জুড়ে রয়েছেন।

নানা বরণ গাভী রে একই বরণ দুধ,
জগৎ ভ্রমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।

তিনি নিজে এসে যদি আমায় ভিক্ষা দেন তবে আমি ভিক্ষা নেব, নতুবা নেব না।

দাসী— তবে যাই। আমি রানিমার কাছে বলে আসি। এই দরজাটা তো বন্ধ। আচ্ছা ওদিক দিয়ে যাই।... ওগো রানিমা! সেই ফকির ভিক্ষা নিলে না।

রানি— তবে রে দাসী! আমার সর্বনাশ হল! সেই ফকির যখন আমার দুয়ার হতে খালি হাতে ফিরে যাবে, তার অভিসম্পাতে আমাদের রাজপ্রাসাদ ভস্ম হয়ে যাবে।

দাসী— রানিমা, সেই ফকির বল্লে...

রানি— কী বল্লে?

দাসী— সেই ফকির বল্লে,—

ভিক্ষার কাঙাল নই ভিক্ষা মেগে খাই,
ঘরে ঘরে মা জননী ডাকিয়া বেড়াই।

রানিমা যদি নিজের হাতে আমাকে ভিক্ষা দেন, তবে আমি ভিক্ষা নেব, নতুবা নয়।

রানি— ওগো দাসী, তবে দে সোনার থালা আমার হাতে। আমি নিজে গিয়ে সেই ফকিরকে ভিক্ষা দিয়ে আসি। সদর দরজাটা খুলে দে, সামনের পর্দাটা তুলে দে। ওই তো ফকির দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওগো ফকির! তুমি ভিক্ষা গ্রহণ কর।

ফকির— মহারানি! আমি গণা-পড়া করে দেখলাম,—

বেটা পুত্র নাইকো তোমার আঁটকুড়ো রানি,
এমন লোকের ভিক্ষা আমি নিতে নাহি জানি।
বাড়ির শোভা নারকেল গাছ, ঘরের শোভা দাওয়া,
বৃক্ষের শোভা ফলপুষ্প, নদীর শোভা খেওয়া।
আকাশের শোভা চন্দ্র-তারা যখন হাসেখেলে,
আর নারী জননীর শোভা যখন কোলে ছেলে।

মহারানি— সেই ছেলে বড় হয়ে বাপ-মায়ের কী কাজ করে?

ফকির—

বৃদ্ধ বয়সে হবে গো পুত্র সকল কাজের বল;
ময়ুত নিদানের কালে মুখে দেবে জল।

এমন পুত্র যখন তোমার কোলে নেই, তখন আমি তোমার হাতের ভিক্ষা নেব না।

রানি—

'ওগো ফকির তুমি জেনেও জান না।
পুত্র-সন্তান আমার যে নাই সে তো বিধাতার কারখানা।
কী কথা শুনালে ফকির কী শুনালে কানে,
তীক্ষ্ণ বর্শার শেষ বিঁধিল পরানে।'

এই কথা বলে সুয়োরানি কাঁদতে লাগলেন। রানির কান্নায় ফকিরের মনে দয়া হল। ফকির তার ঝুলির ভেতর থেকে একটা ঔষধ বের করে বলল—

দেখবে মহারানি!

এই ঔষধ দিলাম তোমার হাতে,
ডালিম ফুলের পাতা মিশায়ে দেবে তাতে;
তোমার ঘরে এক সোনার বরণ ছেলে হবে।
এই কথা বলে, ফকির জিকির হাঁকিল,
এই দণ্ডের মধ্যে ফকির অদৃশ্য হইল।

দিনের পর দিন চলে যায়। রাজবাড়িতে ঢং ঢং করে শঙ্খ-কাঁসর বাজে, রাতের বেলায় মণি-মাণিক্য লাল ইয়াকুতের সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে।

একদিন রাজা বসে আছেন রাজসভায়। উজির-নাজির পাত্তর-মিত্তর হাওয়ালদার সুবেদার জোবেদার চোবেদার পাঙ্খাবরদার খবরবরদার হুকুমবরদার পিয়াদা-পাইক কোটাল জমাদার সবাই মিলে রাজসভা গমগম করছে— ঝমঝম করছে।

মহারাজ! খবর-খবর!

কিসের খবর? কিসের খবর?

এমন সময় রাজবাড়ির দাসী উঠিত পড়ি— পড়িত উঠি— পড়িত পড়ি— একেবারে রাজসভার মধ্যখানে গিয়ে উপস্থিত।

মহারাজ! খবর— খবর।

কিসের খবর? কিসের খবর?

রাজা বলেন, কিসের খবর? মন্ত্রী বলেন, কিসের খবর? কোটাল বলেন, কিসের খবর?

রাজসভা ভরে কেবল— কিসের খবর? কিসের খবর? সবাই খবর শুনতে চায়— খবর শোনার ধৈর্য কারোই নেই।

এমন সময় রাজা বলেন, ওহে চুপ কর...

মন্ত্রী বলেন, ওহে চুপ কর...

কোটাল বলেন, ওহে চুপ কর...

তখন রাজসভা চুপ হল। রাজা বললেন, ওহে দাসী, শীঘ্র বল কিসের খবর?

বৃদ্ধা দাসী হাঁপাতে হাঁপাতে কেবল বলে, মহারাজ! খবর-খবর...

রাজা তখন বললেন, ওগো দাসী, তুমি শীঘ্র বল কিসের খবর?—

মুহূর্ত বিলম্ব যদি করহ এখন

এই তলোয়ারে তোমার ঘাড় করিব কর্তন।

তখন বৃদ্ধা দাসী হাতজোড় করে বলল, মহারাজ, আপনার ঘরে এক পুত্রসন্তান জন্মেছে।

'ওরে দাসী দাসীরে! কী কথা আজ আমাকে শুনালি! আমার কাছে আয়, আমার গজমোতির হার তোর গলায় পরীয়ে দেই।' রাজা আনন্দে নিজের হার খুলে দাসীর গলে পরীয়ে দিলেন।

গজমোতি হার পেয়ে বৃদ্ধা দাসী একেবার হাসে, একবার নাচে— ঠমকে ঠমকে চলে, গমকে গমকে তার পায়ের নূপুর বাজে! রাজা তাড়াতাড়ি পুত্রমুখ দর্শন করতে চললেন। রাজবাড়ির যতসব লোকজন দাস-দাসীগণ তারা সব সেজেগুজে রাজপুত্র দেখতে চলল।

সবে বলে রাজপুত্র,— রাজপুত্র কেমন জনা,

আন্ধার ঘরে রাজপুত্র যেন জ্বলছে কাঞ্চা সোনা।

সাতটা মানিক দিয়ে রাজা পুত্রমুখ দেখলেন।

রাজপুত্রের হাতে চন্দ্র পায়ে চন্দ্র
চান কী জিনিয়া রূপ
যেন হুর পরীপাটি মুখ।

দিনে দিনে দিন চলে যায়। আর একদিন রাজা বসে আছেন রাজসভার মধ্যে। এমন সময় রাজবাড়ির সেই দাসী রাজসভার মধ্যে গিয়ে উপস্থিত।

'মহারাজ! খবর— খবর।'

'ওরে দাসী— দাসীরে! কিসের খবর?'

'মহারাজ, আপনার পুত্র হেসেছে!'

'ওরে দাসী, আয়, আয়! তোকে তিনটি মানিক বকশিস দিলাম।' এক মানিক সাত রাজার ধন। তিনটি মানিক পেয়ে বুড়ি দাসী নাচতে নাচতে চলে গেল।

এমনই করে দিন চলে যায়। রাজপুত্র এখন বারো বৎসরের অষ্টমীর চাঁদ। মুখের হাসি দেখে আকাশের চাঁদ-সূর্য লজ্জা পায়। যখন রাজপুত্র আকাশের দিকে চায়, তখন—

চন্দ্র ডাকিয়া বলে সূর্য ওরে ভাই
মানুষ হইয়া দিল চাঁদের মুখে ছাই।

ডালিমফুলের রস খেয়ে সুয়োরানি এমন ছেলে পেয়েছেন, তাই তার নাম রাখলেন ডালিমকুমার। খেলার সাথিদের নিয়ে সারাদিন ডালিমকুমার খেলে বেড়ায়।

রাজকুমারের অনেকগুলো কবুতর আছে। তাদের সঙ্গে ডালিমকুমারের ভারি ভাব। কোটালপুত্র রাজপুত্রের বন্ধু। দুই বন্ধুতে মিলে কবুতরগুলোকে নানান সাজে সাজায়। তারা পায়রাগুলোকে ধরে তুলিতে রঙ লাগিয়ে তাদের পাখায় নকশা আঁকে। একটা পায়রার পাখায় চাঁদ আঁকে, আর পায়রাগুলোর পাখায় তারা আর ফুল আঁকে।

রঙের পাত দিয়ে তাদের নখগুলোকে মুড়ে দেয়। চাঁদ-পায়রা পাখা মেলে বাঁকা চাঁদের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। আর সব পায়রা তারা আঁকা পাখা বাতাসে মেলে ঝিকিমিকি আকাশে উড়তে থাকে। রাজপুত্র ডালিমকুমার আর তার বন্ধু রূপকুমার হাতে তালি দিয়ে নাচতে থাকে।

রাজার তো দুই রানি। সুয়োরানি আর দুয়োরানি। সুয়োরানির ছেলে হয়েছে, দুয়োরানি হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে যায়। সতিনের হল ছেলে, দুদিন পরে সতিনপুত্র হবে রাজা। সুয়োরানি হবে রাজমাতা। আর আমি? আমি হব ঘুঁটেকুড়ানি দাসী। একবার যদি পেতাম ছোঁড়াটাকে আমার হাতের মধ্যে।

এদিকে হয়েছে কী— একদিন ডালিমকুমারের একটা পায়রা উড়ে এসে দুয়োরানির দরজায় পড়েছে। যেই পড়া অমনি সেটাকে ধরে দুয়োরানি আঁচলের

আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে। এখানে-সেখানে পায়রার খোঁজ না পেয়ে রাজপুত্র ডালিমকুমার দুয়োরানির দুয়ারে এসে উপস্থিত।

রাজপুত্র— ওগো মা জননী!

রানি— কিরে আমার গোপাল এলি রে। আয় আমার সোনার চাঁদ— ওরে আমার কাঁঠালের আমসত্ত্ব! ওরে আমার সোনার নাও পবনের বৈঠা। আয়! আয়! এদিকে আয়।

রাজপুত্র— ওগো মা জননী!

রানি— কী রে বাছা গোপাল!

রাজপুত্র— আমার কবুতর তোমার ঘরে উড়ে এসেছে।

রানি— কই? দেখিনি তো!

রাজপুত্র— ওগো মা-জননী! তুমি মিথ্যা বলছ কেন? তোমার ঘরে আমার পায়রা এসেছে। এই যে তার পাখার পালক পড়ে রয়েছে।

রানি— ও বাতাসে উড়ে এসেছে।

রাজপুত্র— না বাতাসে উড়ে আসেনি! নিশ্চয়ই তুমি আমার পায়রা ধরে রেখেছ।

রানি— ডালিমকুমার! সত্যসত্যই তুমি পায়রা চাও?

রাজপুত্র— সত্যসত্যই আমি আমার পায়রা চাই।

রানি— তবে কিসে তোমার মরণ হবে সেই কথাটা তোমার মা'র কাছ থেকে জেনে এসে আমাকে বল।

রাজপুত্র— ওগো মা-জননী! কিসে আমার মরণ হবে তা জেনে তোমার লাভ কী?

রানি— বাছা রে! তুমি আমার মোমের পুতুল। রোদে রোদে ঘুরে বেড়াও। কোন্ সময়ে উনে যাও, আমার প্রাণটা সবসময় আইঢাই করে। কখন কোথায় আছাড় পিছাড় খেয়ে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে, আমি চোখে তেল দিয়ে তোমার জন্যে কাঁদব।

রাজপুত্র— তবে আমি কী করব?

রানি— তোমার মা'র থেকে জেনে এস, কিসে তোমার মরণ হবে।

রাজপুত্র— তবে আমি যাই। ওই তো সামনের মাঠটা। একদৌড়ে চলে যাই। বাহ বাহ! মা যে ফুলের বাগানটাতে এসেছেন। ওগো মা-জননী!

মা— কী রে বাছা ডালিমকুমার?

রাজপুত্র— একটা কথা—

মা— কী কথা?

রাজপুত্র— ব্যাঙের মাথা।

মা— কী ব্যাঙ?

রাজপুত্র— কোলা ব্যাঙ।

মা— কী কোলা?

রাজপুত্র— ছাও কোলা।

মা— কী ছাও?

রাজপুত্র— চোপ রাও। হাঃ হাঃ হাঃ— দেখলে মা তুমি ঠকে গেলে তো? এইবার আমার কথা রাখ।

মা— কী বল তো?

রাজপুত্র— মা, আমার মরণ কিসে?

মা— ষাট ষাট বাছা আমার, তোমার তা দিয়ে কী দরকার?

রাজপুত্র— তা তোমাকে বলতেই হবে।

মা— না, বলব না।

রাজপুত্র— না, বলতেই হবে।

মা— না, বলব না।

রাজপত্র— সত্যি?

মা— সত্যি।

রাজপুত্র— তিন সত্যি?

মা— তিন সত্যি।

রাজপুত্র— তবে আমি খাব না, বেড়াব না, শোব না, ঘুমাব না, কথা কব না, চুপ করব না— আমি কিচ্ছু করব না।

মা— বাছা ডালিমকুমার!

রাজপুত্র— না, আমি কথা বলব না।

মা— সোনামণি ডালিমকুমার, শোন তোমাকে বলছি।

রাজপুত্র— আগে বল, তারপর শুনব।

মা— আমাদের তালপুকুরে আছে রাঘব বোয়াল, সেই বোয়ালমাছের পেটে আছে একছড়া সোনার হার। যদি কোনো মানুষ সেই সোনার হার গলায় পরে তবে তোমার মৃত্যু হবে।

রাজপুত্র— তবে মা আমি এক্ষুনি যাই, এক্ষুনি যাই।

মা— ওরে ডালিমকুমার ফের ফের, শোন— শোন।

রাজপুত্র— না মা, আমার বড্ড কাজ।

একদৌড়ে মাঠটা পেরীয়ে রাজপুত্র গিয়ে দুয়োরানির দুয়ারে উপস্থিত হল।

রাজপুত্র— ওগো মা-জননী, আমাদের তালপুকুরে আছে রাঘব বোয়াল। তার পেটে আছে একছড়া হার। যদি সেই হার কোনো মানুষ গলায় পরে, তবে আমার মরণ হবে।

রানি— বাছা ডালিমকুমার! আমার মনের সকল ভাবনা আজ দূর হল, আজ হতে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

রাজপুত্র— ওগো মা-জননী, সে কেমন?

রানি— আমাদের তালপুকুরে অগাধ জল, সেই জলে কেউ নামবেও না, সেই রাঘব বোয়ালও কেউ ধরবে না।

রাজপুত্র— ওগো মা-জননী, আমার কবুতর?

রানি— পোড়ামুখো! তা এখনো ভুলতে পারিসনি। এই নে, আমার আঁচলের তলে লুকিয়ে রেখেছিলাম। নিয়ে যা।

রাজপুত্র কবুতর পেয়ে কী খুশি! কবুতরের গায়ে-মুখে চুমো খেয়ে আদর করে লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

এদিকে উননমুখী দুয়োরানি কী করলে শুনবে? রাজপুত্রকে যদি মারতে হয়, তবে তো সেই তালপুকুরের রাঘব বোয়ালটাকে ধরতে হবে।

রানি করল কী— তার বিছানার তোশকের তলে অনেকগুলো প্যাকাটি বিছিয়ে তার উপর বিছানা করে শুয়ে রইল। শুয়ে শুয়ে রানি এ পাশ ফেরে ও পাশ ফেরে আর সেই প্যাকাটিগুলোর মড়মড় শব্দ হয়। দাসদাসীরা সবাই ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে— 'রানি-মা আপনার কী হয়েছে?'

দুয়োরানি কোঁকাতে কোঁকাতে বলে, 'আমার হাড়-মড়মড়ি জ্বর হয়েছে। এ জ্বরে আমি আর বাঁচব না। তোরা শিগগির মহারাজকে খবর দে।'

কথা কইতে না কইতে মহারাজ এসে উপস্থিত হলেন। নিশ্বাস ফেলতে না ফেলতে রাজবৈদ্য এসে উপস্থিত হলেন, জড়িবড়ি কত ঔষধের বোঝা, ভৃঙ্গরাজ, মহাভৃঙ্গরাজ, সুবৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত— কত ঔষধ আনা হল, কিন্তু কিছুতেই দুয়োরানির অসুখ সারল না। রানি চিৎকার করে কাঁদেন; এ পাশ ফেরেন ও পাশ ফেরেন, আর বিছানার তলে সেই প্যাকাটির মড়মড় শব্দ হয়। তখন সকলেই বলল, এ নিশ্চয়ই ভূতপ্রেতের কাজ। রাজবৈদ্য এ অসুখ সারাতে পারবে না। রামশঙ্কর ওঝাকে ডাক।

কথা বলতে না-বলতে রামশঙ্কর ওঝা এসে উপস্থিত। দেখতে দেখতে রামশঙ্কর ওঝা ডাক ছেড়ে মন্ত্র পড়তে লাগল।—

'করাত করাত মহা করাত,
আসতে কাটে যেতে কাটে;
সাত সমুদ্র তের নদী কাটে।
দুয়োরানির ইলে জ্বর, পিলে জ্বর, মিনমিনে জ্বর,
ঘিনঘিনে জ্বর, হ্যাচড়া জ্বর, ফ্যাচড়া জ্বর সকল কাটে
আর পিঙল জটা— পিঙল জটা,

আয়রে আয় মেঘের ঘটা।
মেঘের উপর ডম্বরু বাজে,
দাঁড়ায় যোগিনী মেঘের সাজে।
আসমানে পাও তার জমিনে মাথা,
সাত সমুদ্র জুড়িয়া কাঁথা।
সেই কাঁথা পরীয়া, আয়রে ভূত উড়িয়া।
আমাদের রানিমার গায়ের ইলা জ্বর, পিলা জ্বর,
তেরেক্ষে জ্বর, পেরেক্ষে জ্বর, মহাজ্বর,
সকল যা রে কাটিয়া।'

এই মন্ত্রেও মহারানির হাড়-মড়মড়ি জ্বর সারল না। তখন রামশঙ্কর বৈদ্য ডাকিনী-মন্ত্র পড়তে লাগল—

'আর ডাকিনী মন্ত্র করিলাম সার,
আয়রে ডাকিনী হাজার হাজার।
জটার উপর কঙ্কণ থুইয়া,
ডাক-ডাকিনী নাচে পর্বত লইয়া।
প্রথম ডাকিনী মায় পিত্রালয়ে যায়,
হিমগিরির কুহরে সাজে দাও দানায়।
তারপরে ডাকিনী চলে সন্ধ্যামণির ঘরে,
নিম সন্ধ্যাকালে যেথা রাঙা মেঘ উড়ে।
সেই মেঘে বাইলাম নাও পবন কাণ্ডারী,
কুমেরু পর্বতের শিরে আইলাম ঢেউ নাড়ি।
সেই দেশে আছে ডাকিনীর মায়,
মাথায় ঝাটরা চুল আসমান বায়।
সেই চুল ঝাড়িলাম দুয়োরানির গায়—
দুয়োরানির সকল ব্যারাম যেন সারিয়া যায়।'

তবুও দুয়োরানির অসুখ সারিল না। তখন মহারাজকে ডেকে দুয়োরানি কী বলছেন?

— বলছেন, 'মহারাজ, এ সব তন্ত্রমন্ত্রে আমার এ জ্বর সারবে না। আমার হল আসল হাড়-মড়মড়ি জ্বর। এ কি আর সহজে সারবে?' এই বলে মহারানি বিছানায় এ পাশ ও পাশ গড়াগড়ি দিলেন আর বিছানার তলের প্যাকাটিগুলো মড়মড় শব্দ করে উঠল। রাজা ব্যস্তসমস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন— 'তবে তোমার এই জ্বর কিসে সারবে?'

— 'আমাদের তালপুকুরে আছে রাঘব বোয়াল। সেই বোয়ালমাছ ধরে আমাকে যদি রান্না করে খাওয়াতে পারেন, তবে আমার জ্বর সারবে।'

রাজা— এই কথা! সে আর এমন অসম্ভব কী? আমি এখনই রাঘব বোয়াল ধরার ব্যবস্থা করছি।

রাজার হুকুমে রঘুনাথ জেলে তার সোয়ালক্ষ নাতিপুতি নিয়ে তালপুকুরে জাল ফেলল।

খেলার সাথিদের নিয়ে ডালিমকুমার খেলা করছে, এমন সময় তার বন্ধু কোটালপুত্র এসে তাকে বলল, 'ডালিমকুমার! তোমাদের তালপুকুরে জাল ফেলে রঘুনাথ জেলে তার সোয়ালক্ষ নাতিপুতি নিয়ে রাঘব বোয়াল ধরতে এসেছে। চল দেখে আসি।'

এই কথা যখন ডালিমকুমার শুনতে পেল তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। রাজকুমার বুঝতে পারল, তাকে মারবার জন্য তার সৎ-মা দুয়োরানি আজ পুকুর হতে রাঘব বোয়াল ধরাচ্ছেন। রাজপুত্র তার বন্ধু কোটালপুত্র রূপকুমারকে সব কথা খুলে বলল, 'ভাই রূপকুমার! বিমাতা দুয়োরানি যখনই রাঘব বোয়ালের পেট কেটে সেই হার-ছড়া তার গলায় পরবেন, তখন আমার মৃত্যু হবে।'

রূপকুমার উত্তর করিল, 'ভাই ডালিমকুমার! তুমি ভেব না। এক্ষুনি আমি যাচ্ছি। জোর করে দুয়োরানির হাত থেকে সেই সোনার হার আমি কেড়ে আনব।'

রাজপুত্র বলল, 'ভাই রূপকুমার! সে কাজ তুমি করতে যেয়ো না। তুমি হার কেড়ে আনতে গেলেই দুয়োরানি হারটা ছিঁড়ে ফেলবে, আমার বাঁচার আর কোনো আশাই থাকবে না। আমার মৃত্যুর পর তুমি যদি পার দুয়োরানির হাত থেকে কৌশলে হারটা উদ্ধার করে আমাকে বাঁচিও।'

রাজকুমার ও রূপকুমার এ ভাবে কথা বলছে, এমন সময় আর একজন খেলার সাথি এসে খবর দিল, 'ও ভাই ডালিমকুমার! এইমাত্র জেলে রাঘব বোয়ালটাকে ডাঙায় তুলেছে।' এই খবর শুনতেই রাজকুমারের সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল।

রাজকুমার সবই বুঝতে পারল। সে তার বন্ধু রূপকুমারের গলা জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, 'ভাই রূপকুমার তোমরা আমায় বিদায় দাও। আমি মরে যাব, তাতে কোনো দুঃখ নেই, কিন্তু আমার জনমদুখিনী মা-জননী আমার জন্যে পথে পথে কেঁদে ফিরবে। আমার যদি আর একটি ছোট ভাই থাকত, তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মা-জননী আমার শোক ভুলে থাকত। আমার মুখে মা ডাক শোনবার জন্যে আমার মা যখন ইতিউতি আকুলি-বিকুলি করে ফিরবে, তখন তোরা মা বলে ডেকে আমার মাকে শান্ত করিস।'

রূপকুমার বলল, 'ভাই ডালিমকুমার, তোমাকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়ে কাকে নিয়ে আমরা আবার খেলাঘর সাজাব? যে সব জায়গায় তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা খেলা করে বেড়াতাম, সেইসব জায়গায় একা একা যখন ফিরব, তখন যে তোমার কথাটি মনে করে আমাদের চোখের জল মানতে চাইবে না।

রূপকুমারের গলা জড়িয়ে ধরে ডালিমকুমার আবার বলতে লাগল, 'জীবনের শেষ দেখা আজ তোদের দেখে নিলাম; আমি জানি, আমার মৃত্যুর পর তোরা আর এখানটাতে খেলতে আসবিনে! আমার অভাবে তোদের খেলাঘর ভেঙে যাবে।'

ডালিমকুমার এই কথা বলছে এমন সময় আর একটি খেলার সাথি দৌড়ে এসে খবর দিল, 'জেলে রাঘব বোয়াল ধরে এনে দুয়োরানির হাতে দিয়েছে।'

এই খবর ডালিমকুমার করিল শ্রবণ,
ভূমিতে ঢলিয়া পড়ল হয়ে অচেতন।

সেই সোনার দেহ একবার লাল হয়ে যাচ্ছে, আবার কালো হয়ে যাচ্ছে। রূপকুমার তার মাথাটি কোলের উপর নিয়ে কাঁদতে লাগল। এমন সময় আর একজন খেলার সাথি এসে খবর দিল, 'দুয়োরানি রাঘব বোয়ালটা কেটে তার পেটের মধ্য থেকে সোনার হার-ছড়াটি বের করে ফেলেছে।'

রাজপুত্র ডালিমকুমার তখন এক যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। হায় হায়! মরণকালে রাজপুত্র একবার তার মায়ের মুখখানা দেখতে পেল না। দুয়োরানি হার-ছড়াটা গলায় পরলেই তার প্রাণপাখি দেহ ছেড়ে উড়ে যাবে। রাজপুত্র যন্ত্রণায় ছটফট করে— আর ফ্যাল-ফ্যাল করে এদিক-ওদিক চায় :— 'আহা, মরণকালে একবার যদি মায়ের মুখখানা দেখতে পেতাম। জন্মের মতো পরান ভরে তাকে মা ডাক ডেকে যেতাম! অভাগিনী মা আমার মুখের মা ডাক আর কোনোদিন শুনবে না।'

খবর পেয়ে আলুথালু বেশে সুয়োরানি ছুটে আসছেন। দূর থেকে তার কান্না শোনা যায়। ডালিমকুমার সেই কান্না শুনতে পেয়ে একবার চোখ মেলে চেয়েছে, এমন সময় আর একজন খবর দিল, 'দুয়োরানি হাসতে হাসতে সেই সোনার হার-ছড়া গলায় পরেছেন।'

কথা বলতে-না-বলতে রাজপুত্রের প্রাণপাখি দেহ ছেড়ে উড়ে গেল। শূন্য দেহ মাটিতে পড়ে রইল।

রাজা-রানি রাজপুত্রের শূন্য দেহের উপর আছড়িয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন।

ডালিমকুমারের মায়ের কান্নায় আজ গাছের পাতা ঝরে পড়ে, আকাশ ভেঙে খান খান হয়ে যায়— 'বাছা ডালিমকুমার! জন্মের শোধ একবার মা বলে ডাক! সোনা মুখে একবার একটি কথা বল্।'

কিন্তু কার কথা কে বা বলে। আহা রে! মায়ের বুকে নিদারুণ জ্বালা! যতদিন মায়ের বুকে প্রাণ থাকবে, ততদিন তুষের অনলের মতো এ জ্বালা ধিকিধিকি জ্বলতে থাকবে।

শুকনা গাছের ডালে বসে ডাকে কাগা,
আপন বেটা মরে গেলে মা-র কলিজায় দাগা।

মৎস্যে চেনে গহীন গম্ভীর পঙ্খী চেনে ডাল,
মায় সে জানে বেটার দরদ যার কলিজায় শেল।
পুত্রশোক বিষম শোক যার হয় সেই জানে;
পাষাণে ঠুকিয়া মাথা মরবে মায় পরানে।

রাজকুমারের মৃতদেহ বুকে জড়িয়ে মা আবার কান্দে—

কার বা গাছের ডালিম কুমড়ার ছিঁড়ে দিলাম কলি,
সে আমারে দিছে গালি পুত্রশোকী বলি।
কোন জালুয়ার মাছ খেয়েছি, নাহি দিয়ে কড়ি,
সেই আমারে করছে কাঙাল পুত্রশোকী করি।

এ কান্দনের বুঝি আর বিরাম নাই।

রূপকুমার যেয়ে রাজা-রানিকে বলল, 'আমার বন্ধু ডালিমকুমারের মৃতদেহ আমি পোড়াতে দেব না। গহন জঙ্গলের মধ্যে জোড়মন্দির ঘর তুলে আমার বন্ধুর মৃতদেহ আমি সেইখানে নিয়ে রাখব! আর সারাজীবন ভরে তাকে পাহারা দেব, যদি কোনেদিন তাকে বাঁচাতে পারি।'

রাজা-রানি কোটালপুত্র রূপকুমারের কথায় সম্মতি দিলেন। সোনার বরণ ডালিমকুমারের মৃতদেহ চন্দন মাখিয়ে ফুলের মালায় সাজিয়ে সোনার পালঙ্কে করে সেই বনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল। রাজা-রানি কাঁদতে কাঁদতে বন হতে ঘরে ফিরে গেলেন।

রূপকুমার দেখতে-না-দেখতে সেই বিজাবন জঙ্গলের মধ্যে এক জোড়মন্দির ঘর তুলে ফেলল! তারপর সেই ঘরের মধ্যে রাজপুত্রের পালঙ্কখানা রেখে তার উপর লতা-পাতা ফুল-ফল ছড়িয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে রূপকুমার প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে যায়। যাবার সময় বন্ধুর শিয়রের কাছে নানারকমের কত কী খাবার রেখে যায়। তার মনের ধারণা যদি কোনো দৈবযোগে কোনোপ্রকারে বন্ধু তার জীবন পেয়ে ওঠে সে এই খাবারগুলো খাবে। ভোর হলে রূপকুমার এসে জোড়মন্দির ঘরের দরজা খোলে! কিন্তু হায়! খাবারগুলো সে যে ভাবে রেখে গিয়েছিল সেগুলো সেইভাবেই পড়ে রয়েছে। কেউ খায়নি! তখন মনের দুঃখে রূপকুমার সেই খাবারগুলো যমুনার জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসে।

একদিন ভোর না হতেই রূপকুমার সেই জোড়মন্দির ঘরের দরজা খুলে আশ্চর্য হয়ে দেখতে পেল, আগের সন্ধ্যাবেলা সে বন্ধুর শিয়রের পাশে যে সব খাদ্যসামগ্রী রেখে গিয়েছিল, কে সেগুলো খেয়ে গেছে। রূপকুমার মনে মনে ভাবতে বসল।

এখন হয়েছে কী, দুয়োরানি তো সেই সোনার হার-ছড়া সারাদিন গলায় পরে থাকেন, আর রাত হলে গলা থেকে হার খুলে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। রাতে যখন

দুয়োরানি গলা থেকে হার খুলে রাখেন, তখনই রাজপুত্র ডালিমকুমার জেগে ওঠে, আর জেগে উঠে এদিক-ওদিক তাকায়! কোথায়ও কোনো জনমানবের সাড়া নেই। জোরে ডাক ছাড়লে সেই ডাক-প্রতিধ্বনি হয়ে নিজেরই কানে ফিরে আসে। কেউ কোনোখান হতে সাড়া দেয় না। বাপের জন্য রাজপুত্র কাঁদল— মায়ের জন্য রাজপুত্র কাঁদল।— তার জনমদুঃখিনী মা-জননী না জানি তাকে হারিয়ে কেমন করে দিন কাটাচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে রাজপুত্রের বুক ভেসে যায়! কেঁদে কেঁদে রাত ভোর হয়ে যায়! সকালবেলা দুয়োরানি যেই সোনার হার-ছড়াটি গলায় পরেন, তখন ধীরে ধীরে রাজপুত্র মরণ-ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ে।

সেদিন সন্ধ্যার পর রাজপুত্র ঘুম হতে জেগে উঠে কী মনে করে তার শিয়রের খাবারগুলো খেয়ে ফেলল। পরদিন ভোরে তার বন্ধু রূপকুমার তাই-না দেখে মনে মনে ভাবতে বসল। ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যা হয়ে এল। আগের মতোই রূপকুমার তার বন্ধুর শিয়রের কাছে খাবারগুলো রেখে একপাশে লুকিয়ে রইল, ঘরে ফিরে গেল না।

হঠাৎ ডালিমকুমার ঘুম হতে জেগে উঠল। জেগে উঠেই এদিক-ওদিক চাইতে লাগল। তখন রূপকুমার তার সামনে এসে দাঁড়াল। রূপকুমারকে দেখে রাজপুত্র আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর সেই গহন জঙ্গলের মধ্যে দুই বন্ধুতে কত কথা।

রাজপুত্রের মা-বাবা কেমন আছেন? তাকে ছেড়ে কেমন করে তাদের দিন কাটে? খেলার সাথিরা কি তার কথা মনে করে? রাজপুত্রের এত সাধের কবুতরগুলোকে এখন কে আদর করে? কে তাদের পাখায় রঙিন নকশা আঁকে?— এমনি কত কথা! কথায় কথায় কথা কি ফুরোয়?

এত আনন্দ, এত খেলা, এত মেলা, এত ভালোবাসা, এত আদর, সেই বাড়িঘর, মা-বাপ,— তাদের কাছে রাজপুত্রের যাবার সাধ্য নেই। রাজপুত্র যে বেঁচে আছে, মরেনি, এই খবরও যদি সেই উননমুখী দুয়োরানি জানতে পারে, তবে সে তার গলার হার-ছড়াটি ছিঁড়ে ফেলবে— জনমের মতো সে আর মরণ-ঘুম হতে জাগতে পারবে না।

সারারাত দুই বন্ধুতে মিলে নানারকম জল্পনা-কল্পনা করে। বন্ধু রূপকুমার রাজপুত্রকে আশ্বাস দেয়, 'যেমন করেই হোক, একদিন-না-একদিন তোমাকে এই অবস্থা হতে উদ্ধার করব।'

এদিকে আর একটা কথা তোমাদের বলি। এক দেশের এক রাজার এক মেয়ে হল। গণকঠাকুর তার হাত দেখে বলল, যদি কোনো মরা রাজপুত্রের সঙ্গে এর বিয়ে দিতে পারা যায়, তবে এ মেয়ে বাঁচবে, নইলে ষোল বৎসর বয়স হলেই এ মেয়ে মারা যাবে।

দিনে দিনে দিন চলে যায়, চৌদ্দ বৎসর বয়স যখন রাজকন্যার হয়, তখন সেই দেশের রাজা-দাস-দাসী সঙ্গে দিয়ে রাজকন্যাকে পাঠিয়ে দিল দেশে-বিদেশে মরা রাজপুত্রের খোঁজে। রাজকন্যা এ দেশে যায়— ও দেশে যায়— সে দেশে যায়।

কোথাও মরা রাজকুমারের খোঁজ পায় না। ঘুরতে ঘুরতে রাজকন্যা এক বিজাবন জঙ্গলের মধ্যে এসে উপস্থিত হল। সেখানে দেখে কী এক সুন্দর জোড়মন্দির ঘর। সেই ঘরের মধ্যে সোনার পালঙ্কে শুয়ে এক সুন্দর রাজপুত্র ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছে। রাজকন্যা সেই ঘুমন্ত রাজপুত্রের গলায় মালা পরীয়ে দিল। রাজকন্যার সখিরা বিয়ের শুভশঙ্খ বাজাল— জয়-জোকার দিল। তারপর রাজকন্যাকে সেই বনের মধ্যে রেখে তারা দেশে ফিরে গেল।

রাতের বেলা ডালিমকুমার যখন জেগে উঠল, তখন রাজকন্যার মনে কী সুখ! রাজকুমারও সেই নির্জন বনের মধ্যে এক সুন্দর খেলার সাথিকে পেয়ে কম সুখী হল না। বন্ধু রূপকুমার বনের ফুল এনে, লতাপাতা কুড়িয়ে এনে তাদের খেলাঘরটি আরও সুন্দর করে সাজাল।

এমনি করে দিনের পর দিন চলে যায়। রাজপুত্রের দুই-তিনটা ছেলেমেয়ে হল। বনের মধ্যে তারা খেলাধুলা করে বেড়ায়। নল ভেঙে জল খায়— গাছের ডাল ভেঙে ফল খায়। তারা জানতে পারল না, এই দেশের রাজবংশের তারা ছেলেমেয়ে— সোনার থালায় তাদের জন্য সোনার ভাত জুড়িয়ে যাচ্ছে, রুপোর গেলাসে রুপোর জল গড়িয়ে পড়ছে।

বন্ধু রূপকুমার আর রাজকন্যা দুইজনে সারাদিন পরামর্শ করে, কী করে রাজকুমারকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করবে। অনেক ভেবে তারা একটি মতলব বের করল।

পরদিন রাজকন্যা তার ছেলেমেয়েদের খুব সুন্দর করে সাজিয়ে নিজে খুব সুন্দরী নাচনে-ওয়ালির সাজে সেজে পায়ে উমুর-ঝুমুর নূপুর পরে রাজবাড়িতে দুয়োরানির দরজায় এসে উপস্থিত হল।

তখন সেই সুন্দরী নাচনে-ওয়ালিকে দেখে দুয়োরানি কী বলছিলেন?—

রানি— ওহে নাচনে-ওয়ালি!

নাচনে-ওয়ালি— বলুন মহারানি!

রানি— তোমার নাচ দেখতে কত টাকা লাগে?

নাচনে-ওয়ালি— আমার নাচ দেখতে একশ টাকা লাগে।

রানি— আচ্ছা তোমার নাচ দেখাও।

উমুর-ঝুমুর নূপুর বাজিয়ে আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে নাচনে-ওয়ালি নাচল। হেলেদুলে অমকে-গমকে ঘুরল ফিরল। দেখে দুয়োরানি বড়ই খুশি হলেন। তিনি নাচনে-ওয়ালিকে ডেকে বললেন, 'ওহে নাচনে-ওয়ালি! এই নাও, তোমার একশ টাকা পুরস্কার।'

নাচনে-ওয়ালি দুই হাত উপরে তুলে বলল, 'আপনার জয় হোক, রানি-মা।'

এমন সময় নাচনে ওয়ালির ছোট্ট ছেলেটা কাঁদতে লাগল। তাকে আগের থেকেই শিখিয়ে রাখা হয়েছিল কাঁদবার জন্য। তার কান্না শুনে দুয়োরানি কী বলছেন?—

রানি— ওহে নাচনে-ওয়ালি! তোমার ছেলেটি কাঁদে কেন?

নাচনে-ওয়ালি— সে কথা আর বলবেন না, রানি-মা! এমন ছেলেকে সঙ্গে নিয়েও লোকের বাড়িতে আসে! যেখানে যা দেখবে তাই চেয়ে বসবে।..

এই বলে নাচনে-ওয়ালি গুড়ুম গুড়ুম করে ছেলের পিঠে দুই-তিনটা কিল মারল। ছেলে দ্বিগুক্ষণ চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

রানি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা নাচনে-ওয়ালি! কী চায় তোমার ছেলে? কিসের জন্য এত কাঁদে?

নাচনে-ওয়ালি জোড়-হাত করে বলল, 'রানিমা! সে কথা আর বলবেন না, যা হবার নয় তাই আমার ছেলে চায়। সে চায় আপনার ওই হার-ছড়া গলায় পরবার।'

রানি তখন বললেন, 'এই কথা। তা দাও না আমার হার-ছড়া ওর গলায়।'

নিজের গলা হতে খুলে দুয়োরানি সেই হার-ছড়াটি ছেলেটি গলায় পরীয়ে দিলেন।

খানিকক্ষণ পরে নাচনে-ওয়ালি সেই হার-ছড়া ছেলের গলা হতে খুলে দুয়োরানির হাতে দিতে যাচ্ছে, ছেলে একেবারে আছাড়ি-পিছাড়ি কান্না জুড়ে দিল।

দুয়োরানি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা নাচনে-ওয়ালি! আবার তোমার ছেলে কাঁদে কেন?'

নাচনে-ওয়ালি হাতজোড় করে বলল, 'রানি-মা! কিছুতেই ও হার-ছড়া গলা থেকে খুলতে চাইছে না। এই কাছেই আমার ঘর। আপনি যদি অনুমতি করেন আমি চলে যাই। ও একটু ঘুমুলেই হার-ছড়া খুলে এনে আপনাকে দেব।'

দুয়োরানির তো মণি-মাণিক্যের অভাব নেই। কী আর এমন একছড়া হার! যদি ফিরিয়ে না-ই দেয় তাতেই-বা কী আসে যায়! যে জন্য হার-ছড়ার একদিন আদর ছিল, সে কাজ তো কবেই শেষ হয়ে গেছে। সেই সতিন-পুত ডালিমকুমার কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। হেসে দুয়োরানি বললেন, 'তা নিয়ে যাও হার-ছড়া, ছেলেটি ঘুমোলেই দিয়ে যেও।'

নাচনে-ওয়ালি উত্তর করল, 'সে কথা আর বলতে রানিমা! কী অলক্ষুণে ছেলে হয়েছে মাগো! যা দেখে তাই পেতে চায়।'

হার দেওয়ার জন্য দুয়োরানিকে আরও একশ'বার তারিফ করে নাচনে-ওয়ালি মনের আনন্দে নাচতে নাচতে বনে প্রবেশ করল। বনে প্রবেশ করে ডালিমকুমারের গলায় সেই হার-ছড়া পরিয়ে দিতেই ডালিমকুমার জেগে উঠল!

তারপর ডালিমকুমার সোনার কলি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করে, চাঁদের মতো বউকে পাশে করে আর ধ্রুবতারার মতো বন্ধুকে সামনে নিয়ে রাজপুরীতে ফিরে এল।

রাজপুরীতে রাজপুত্রের আগমন শুনে চারিদিক হতে লোকজন ছুটে এল! বহুদিন পরে রাজপুরীতে আবার জয়ডঙ্কা বাজলো।

পুত্রশোকে রাজা-রানি অন্ধ হয়ে গেছেন। তাঁদের শিয়রে দাঁড়িয়ে ডালিমকুমার ডাকে—

'জাগ জাগ মা-জননী আঁখি মেলে চাও,
অঞ্চলের বাতাসে মাগো মুখখানি মুছাও।'

ডালিমকুমারের এই ডাক শুনে মায়ের মনে বিশ্বাস হয় না। কতদিন মা এমনি স্বপ্নে দেখেছেন, শিয়রে দাঁড়িয়ে ডালিমকুমার ডাকছে।

স্বপ্ন ভেঙে গেলে বড় আশায় মা চক্ষু মেলে এদিক-ওদিক তাকিয়েছেন, কাউকে দেখতে পাননি। তাই আজকের এই ডাক শুনে মা চক্ষু মেলতে চান না, যদি চক্ষু মেললে সোনার জাদু পালিয়ে যায়! কেঁদে কেঁদে মা বলেন, 'বাছা রে এমনি করে তুই ডাক।— শুনতে শুনতে আমি চিরকালের মতো ঘুমিয়ে যাই। এত সুখের ঘুম যেন আমার ভাঙে না। বাছা রে!— '

পুত্রশোক বিষম জ্বালা যার হয় সেই জানে,
নিদারুণ তুষের অনল জ্বলে রাত্র-দিনে।

ডালিমকুমার ছেলে আর বউ সঙ্গে করে মায়ের চরণতলে এসে প্রণাম করল। একফোঁটা চোখের জল মায়ের পায়ের উপর পড়ল। মা চক্ষু মেলে চাইলেন।

'সোনামণি বাছা ডালিমকুমার, সত্য সত্য তুই ফিরে এলি?' মা এগিয়ে গিয়ে ছেলের গলা জড়িয়ে ধরলেন। রাজা চোখ মেলে চাইলেন। সারা রাজ্য ভরে আনন্দের তুফান ছুটল। ঢোল, ডগর, খঞ্জরির বাদ্যে সারা রাজ্য তোলপাড় করে তুলল।

আমার কথাটি ফুরোল,
নটে গাছটি মুড়োল।
'কেনরে নটে মুড়ালি?'
'তোর গরুতে খাইল কেন?'
'গরু কেন খাইলি নটে?'
'রাখাল কেন ঘাস দেয় না।'
'কেনরে রাখাল ঘাস দেস না।'
'গেরস্ত কেন খেতে দেয় না?'
গেরস্তের ছোট মন,
রাখতে নারে লোকজন।
যাওরে কথা বনে,
যখন বলি তখন এসো মনে।

# অপরূপ-কথা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মস্ত বড় রাজা—

এ কালের নয়, সে কালের। সুতরাং লোক-লস্কর, সৈন্য-সামন্ত, হাতি-ঘোড়া বিস্তর— তার আর লেখা-জোখা নেই।

রাজ্যের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত যেতে সারাদিন লেগে যায়। অবশ্য একটু বেলা করে বেরোতে হয়। মাঝে ঘণ্টা-আষ্টেক জিরিয়েও নিতে হয় বই কি!

হাতিশালে হাতি... হাতি ছিল, আপাতত মরে গেছে। ঘোড়াশালে ঘোড়া কিন্তু আছে! বুড়ো হয়ে বাতে আর চলতে পারে না, কিন্তু তা হোক, চিঁহি চিঁহি করে ডাকে— খাবার না পেলে।

লোক-লস্কর তো বলেছি লেখা-জোখা নেই। হাঁক দিলে অমন পিলপিল করে চার-পাঁচজন বেরিয়ে পড়তে পারে— সবসময়ে অবশ্য বেরোয় না। মাসকয়েক মাইনে না পেয়ে একটু বেয়াড়া হয়ে পড়েছে।

সুতরাং মস্ত বড় রাজা।

রাজার জমকালো দরবার। মন্ত্রী, কোটাল, পাত্র-মিত্র-প্রহরী প্রভৃতি রাজাকে ঘিরে আসর জমিয়ে বসে থাকে। প্রভৃতি অবশ্য একজন ছোকরা চাকর। তাকে নিয়ে হল ছ'জন।

মন্ত্রী সবসময় থাকতে পারে না, মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে তাঁকে বাজার-টাজার করে আনতে হয়। কোটাল রান্না চড়িয়ে সময় পেলেই কিন্তু এসে বসেন। পাত্র-মিত্র ঠায়

বসে থাকেন। তাঁদের একজনের বাত আর একজনের হাঁপানি; দরবারের সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করলে বাড়ে।

রাজসভায় রাজকার্য চলে সারাদিন।

গোমড়া মুখে সবাই বসে থাকেন। রাজা থেকে থেকে পিঠের জামা তুলে ডাকেন— 'মন্ত্রী—'

ব্যস, আর কিছু বলতে হয় না। মন্ত্রী বজ্রগম্ভীর হাঁক দিয়ে ডাকেন— 'প্রহরী!' প্রহরী এসে লম্বা কুরনিশ করে ট্যাঁক থেকে ঝিনুক বার করে দেয়।

মন্ত্রী রাজার পিঠ চুলকে দেন।

খানিক বাদে রাজা বলেন— 'হুঁ।'

মন্ত্রী চুলকোন থামিয়ে প্রহরীর হাতে ঝিনুক ফিরিয়ে দেন। প্রহরী আবার কুরনিশ করে ঝিনুক ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে জায়গায় ফিরে যায়।

আবার সব চুপচাপ।

খানিক বাদে রাজা মন্ত্রীর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলেন, 'মন্ত্রী!'

কাঁপতে কাঁপতে মন্ত্রী বলেন, 'হুজুর!'

'তোমার গর্দান যাবে, জান?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'কেন জান?'

'আজ্ঞে না।'

রাজা ধমক দিয়ে বলেন, 'কী! জান না?'

মন্ত্রী শশব্যস্ত হয়ে বলেন, 'আজ্ঞে জানি।'

'বল, কেন?'

মন্ত্রী আমতা আমতা করেন।

রাজা ধমক দিয়ে বলেন— 'অকর্মণ্য! এত বড় একটা রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে কেন তোমার গর্দান যাবে, তা তুমি বলতে পার না?'

মন্ত্রীর হঠাৎ বুদ্ধি খুলে যায়। বলেন, 'হুজুর, এত বড় রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে এই সামান্য কথা নিয়ে আমি মাথা ঘামাব? এ হল কোটালের কাজ।'

রাজা বলেন, 'হুঁ, ঠিক বলেছ, বল কোটাল।'

কোটাল কানে একটু খাটো। শুনতে পায় না। মাথা নিচু করে নিজের মনে বিড়বিড় করে।

রাজা আবার হাঁক দেন— 'কোটাল!'

এবার কোটাল শুনতে পায়, লাফ দিয়ে উঠে কুরনিশ করে বলে, 'হুজুর!'

'কেন মন্ত্রীর গর্দান যাবে?'

কিন্তু তাতে হয় না। অগত্যা কোটালের কানটা ধরে কাছে টেনে মন্ত্রীকে চেঁচিয়ে বলতে হয়— 'কেন আমার গর্দান যাবে, রাজা জিগ্যেস করছেন।'

একগাল হেসে এবার কোটাল বলে, 'আজ্ঞে, এর আগেই যাওয়া উচিত ছিল, ওর মুখখানা যা বিশ্রী!'

মন্ত্রী চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে।

রাজা বলেন— 'চোপ, হল না।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ' বলে কোটাল থপ করে বসে পড়ে।

রাজা বলেন, 'যে বলতে পারবে, তার বখশিশ মিলবে, ভুল হলে গর্দান!'

সবাই সবার মুখের পানে চায়, কেউ রা কাড়ে না।

রাজা এক-এক করে জিজ্ঞাসা করেন। কেউ কথা কয় না। সবশেষে ডাক পড়ে ছোকরা চাকরের।

ছোকরা চাকর একা একাই মেঝেয় বসে তাস নিয়ে পেটাপিটি খেলে। রাজার ডাকে মুখ না তুলেই বলে— 'আজ্ঞে, চুলকোন বেশি হয়েছে, আপনার পিঠ জ্বালা করছে।'

'ঠিক।'

সবাই মাথা নেড়ে বলে, 'ঠিক, হতভাগা আগে না বললে আমরাও বলতে যাচ্ছিলাম।'

রাজা বলেন— 'নাও বখশিশ।'

ছোকরা চাকর মাথা না তুলেই বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দেয়। রাজা এ পকেট ও পকেট খুঁজে শেষকালে ফতুয়ার পকেট থেকে একটা আস্ত টাকা বার করে দেন।

ছোকরা চাকর সেটা ঠং করে মাটিতে ঠুকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে— 'এটা অচল।'

রাজা টাকাটি আবার পকেটে পুরে বলেন— 'আচ্ছা, কাল নিও।'

তারপর আবার চুপচাপ।

রাজার স্মরণশক্তি অত্যন্ত বেশি। ঘণ্টাকয়েক বাদে মন্ত্রীর দিকে চেয়ে বলেন, 'তোমার না গর্দান যাবে?'

'আজ্ঞে, যাবে বই কী! তবে আজকে তো আর হয় না, আজ কোথাও যাত্রা নাস্তি।'

'বেশ কাল যেন মনে থাকে!'

খানিক বাদে রাজার হাই ওঠে। রাজা বলেন— 'ব্যস্ আজকের মতো সভা ভঙ্গ।'

এমনি করে রাজ্যশাসন চলে। রাজার দোর্দণ্ড প্রতাপে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়। অবশ্য বাঘ জল ছাড়া আরো কিছু খায়। চোর-ডাকাত রাজ্যের ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না। তাদের মজুরি পোষায় না।

এহেন সুখের রাজ্যে একদিন এক বিপদ ঘটল।

**চিরায়ত গ্রন্থমালা**

এবং

**চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা**

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

**বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র**

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি **'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'**র
অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

Bangla Bhashar Shera
Since
198
* 1900501 *
Tk. 160.00